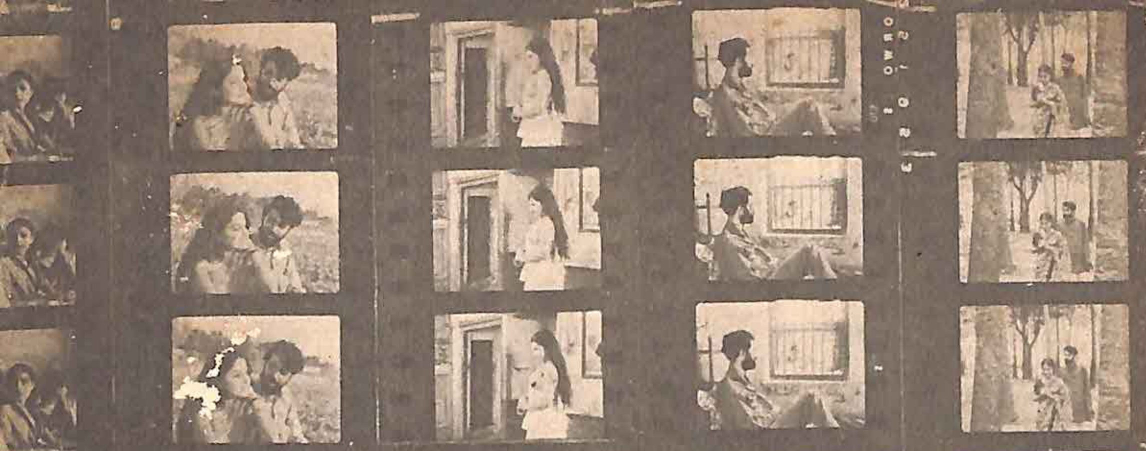


# ৪·২ কেমন করে সিনেমা তৈরি হয়



1979 (*Saka* 1900)
Reprinted 1981 (*Saka* 1903)
Reprinted 1986 (*Saka* 1908)



ছবি: ফিল্ম এ্যাণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিট্যুট অফ ইণ্ডিয়া, ন্যাশনাল ফিল্ম আরকাইভস, ফিল্মফেয়ার এবং লেখকের সৌজন্যে প্রাপ্ত। প্রচ্ছদ: অবতার কল প্রোডাকসনসের '27 ডাউন' ছবির ফিল্ম ষ্ট্রিপস।

*Original* : How Films are made (English)
*Bengali Translation* : Kemon Kore Cinema Tairi Hoy



Published by Director, National Book Trust, India, A-5 Green Park, New Delhi-110016 and printed by Jupiter Offset Press, B-10/3, Jhilmil Industrial Area, Delhi-110032

নেহেরু বাল পুস্তকালয়—41



# কেমন করে সিনেমা তৈরি হয়

খাজা আহম্মদ আব্বাস

অনুবাদ

অমিতাভ চক্রবর্তী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নয়াদিল্লি



স্টুডিওর বাইরে শুটিং—ক্যামেরা ক্রেন

# রূপোলি পর্দায় যাদু

চার পাশের আলো ক্ষীণ হতে হতে নিভে গেল। দর্শক-ঠাসা হলঘর জুড়ে নেমে এল নীরবতা।

চেয়ারে বসে যারা টিকিয়া খাচ্ছিল, চিবোচ্ছিল মকাই, বন্ধ হলো তাও।

সকলেরই দৃষ্টি সামনের পর্দায়, যাকে বলা হয় রূপোলি পর্দা। কেননা, এর রঙ রূপোর মতো উজ্জ্বল সাদা।

পর্দার বুকে শুরু হয়ে গেল এক যাদুর খেলা। দেখতে পেলে, একটা বিজ্ঞাপনের ছবি চলছে। রঙীন অথবা সাদা-কালো। ছবিটাতে হয়তো বোঝানো হচ্ছে, ডঃ দাঁতওয়ালার টুথপেষ্ট বা লাকি সাবান কেন সবার সেরা। কিম্বা, ধরো, দেখানো হচ্ছে সরকারী ফিল্ম ডিভিশন প্রযোজিত ভারতীয় সংবাদ বিচিত্রা। তাতে আছে নানা দৃশ্য ঃ মন্ত্রীদের বক্তৃতা, জওয়ানদের কুচকাওয়াজ, বিক্ষোভকারীদের বাস পোড়ানো বা ইটপাটকেল নিক্ষেপ, ক্রীড়ারত শিশুদের হাসিমুখ। অথবা প্রদর্শিত ছবিটি একটি রঙীন কাহিনীচিত্রও হতে পারে। এতে আছে একটি গল্প। আর আছে তোমাদের প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী—অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্না অথবা ধর্মেন্দ্র, দেব আনন্দ। হেমা মালিনী, শর্মিলা ঠাকুর অথবা পরভীন বাবী। ছবি যাই দেখানো হোক না কেন, সব ক্ষেত্রেই রয়েছে ওই যাদুর খেলা। চলমান ছবির যাদু।

মোটরগাড়ি চলছে, ট্রেন ছুটছে, ঘোড়া দৌড়ুচ্ছে। নায়ক বীরবিক্রমে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এক ডজন ভিলেনের সঙ্গে, নায়িকা নাচছে, কমেডিয়ান হাসছে এবং তোমাদের হাসাচ্ছে। এসবই চলমান দৃশ্য। এ সবই যাদু।

তোমরা জানো, সিনেমা হলে যে ছবি দেখা যায়, তা আলোকরশ্মির সাহায্যে পর্দার বুকে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, কেমন করে ছবির মানুষগুলোকে রঙীন দেখায়? কেমন করে তারা চলাফেরা করে? তারা কেমন করেই বা কথা বলে অথবা গান গায়?.

এদিকে ছবি চলছে। এতক্ষণে তোমরা পৌঁছে গিয়েছ এক যাদু মহলে …হাজির হয়েছ এক রূপকথার রাজ্যে, যেখানে নায়িকারা অপূর্ব স্থন্দরী, নায়করা স্বভাবে কেমন চটপটে আর পরে আছে জমকালো পোশাক, ভিলেনরা কালো আর দেখতে শয়তানের মতো। এইসব দেখতে দেখতে তোমরা আর তোমাদের নিজেদের জায়গায় নেই। পরিচিত গ্রাম, শহর বা দেশ ছেড়ে এমন এক দেশে পৌঁছে গিয়েছ, যা আগে জানা ছিল না। সেই নতুন দেশ তখনই সত্য, যতক্ষণ রূপোলি পর্দায় চলতে থাকে ওই যাদুর খেলা। পর্দার বুক থেকে ছবি মিলিয়ে গেলে যাদুও শেষ। আর তখন হল জুড়ে আবার জ্বলে ওঠে আলো।





শাবানা আজমী

রূপোলি পর্দার বুকে চলমান ছবির এই যাদু দেখে তোমরা খুবই বিস্মিত। কেমন করে ঘটে এসব? কারা তৈরি করে ওই যাদু? অর্থাৎ, এক কথায়, তোমরা জানতে চাও, কেমন করে তৈরি হয় সিনেমা?



# চলমান ছবি আসলে চলে না

বিজ্ঞান হলো সেই যাদুকর যে রূপোলি পর্দায় ছবিকে সচল করে তোলে। আসলে কিন্তু ছবি আদৌ চলে না। ছবির মানুষগুলোর চলাফেরার ভঙ্গী থাকে মাত্র। তোমাদের দেখে মনে হয়, ওরা বুঝি সত্যি সত্যি চলছে। আসলে ওগুলো হলো রঙীন অথবা সাদা-কালো স্বচ্ছ ফিল্মে তোলা পরপর সাজানো স্থির চিত্রের সমাহার। ফিল্মে তোলা একটি ছবির আকার বলতে গেলে একটি ডাক টিকিটের আয়তনের কিছু বেশি। কিন্তু পর্দার বুকে যখন প্রতিফলিত করা হয়, তখন তার আয়তন অনেক অনেক বড় দেখায়—প্রায় একশত গুণ। ছবি দেখানো হয় আলোকরশ্মির সাহায্যে। অপারেটার তার যন্ত্রের সাহায্যে পর্দার বুকে ওই বহুগুণ শক্তিসম্পন্ন আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত করেন। আর তারই সাহায্যে ছবি পর্দার বুকে আলোয় ভেসে ওঠে।

তোমরা চলমান যাদুর মূল ব্যাপারটা চোখে দেখলে, যদিও সঠিকভাবে তা জানা নেই।

আচ্ছা, তোমরা নিশ্চয়ই প্রদীপের আলো, লণ্ঠন অথবা আগুনের সামনে বসেছো। তখন যদি আলোর সামনে হাতের পানজা মেলে ধরো, দেখবে তারও ছায়া পড়েছে দেয়ালে। এবার যদি ওই হাতের আঙ্গুল নানা রকম ভাবে মুড়ে নেও, বেঁকিয়ে ধরো, তাহলে দেখবে দেয়ালের ছায়ার চেহারা বদলে গেলো। কোনটা হয়েছে খরগোসের মতো, কোনটা বেড়ালের মতো, কোনটা বা ডানা মেলে উড়ে যাওয়া পাখির মতো। আবার দেখবে, তোমার হাতটা যত আলোর কাছে নিয়ে আসবে, দেয়ালে ছায়াছবিও ততই বড় দেখাচ্ছে। বিশ্বাস করো আর নাই করো, ছেলেমানুষী ওই ছায়াবাজি খেলাই কিন্তু সিনেমা শিল্পকলার গোড়ার কথা।

তোমরা কি দেখেছো, তোমাদের ছোট ভাইটি রঙ কিম্বা রঙীন পেনসিল দিয়ে কেমন মজাদার সব ছবি আঁকে—বাড়ির, গাছের, বেড়ালের কিম্বা ইঁদুরের? ছোট ভাইটি যে সব ছবি আঁকে তাতে যা সব মজার ব্যাপার থাকে তার সঙ্গে তুলনা করা যায় ওয়ালট ডিজনের শিল্পকলার—যিনি বিশ্ববিখ্যাত কারটুন সিনেমা ও মিকি মাউসের স্রষ্টা। আর এই করে তিনি জগৎজোড়া সব বয়সের লক্ষ লক্ষ শিশুর মন জয় করে নিয়েছেন।

তোমরা কি কখনও তোমাদের স্কুলের নাটকে যোগ দিয়েছ, তাহলে সেই নাটকের স্টেজটাকে কল্পনা করো একটা স্টুডিও বলে, যে স্টুডিওতে ছবি তৈরি হয় আর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করে থাকেন।

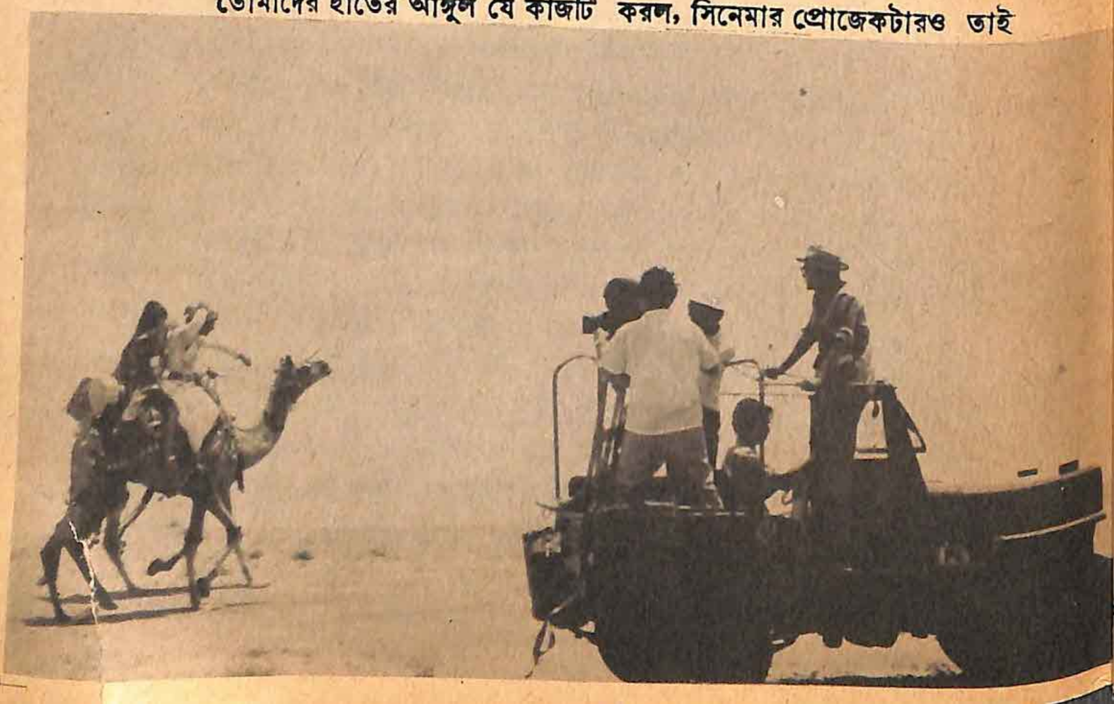
তোমরা অথবা তোমার বন্ধুদের কারো কাছে একটা বক্স ক্যামেরা আছে? সে কি কখনও তোমার ছবি তুলেছে? অথবা ঐ ক্যামেরা দিয়ে তুমি কি তোমার বন্ধুর ছবি তুলেছ? ছবি তোলার জন্য তুমি যখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়াও, তখন তোমার চেষ্টা থাকে এমন ভঙ্গীতে দাঁড়াতে যাতে তোমাকে সব চেয়ে ভালো দেখায়। আর তার জন্য তুমি হয়তো মাথাটা একটু এদিকে অথবা ওদিকে হেলিয়ে দিলে। এই যে তুমি এসব করছ, এ সবই হচ্ছে একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কাজ। তাঁরাও ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান নানা ভঙ্গিমায়। বক্স ক্যামেরায় ছবি তুলছে যে ছেলেটি, সে তোমাকে বললো মুখটা একটু উঁচুতে তুলতে বা একটু নিচে নামিয়ে আনতে যাতে আলো তোমার মুখের সব জায়গায় ঠিক ভাবে পড়ে। ছেলেটির এই কাজ আসলে সিনেমার ক্যামেরাম্যানের, এমন কি সিনেমার

পরিচালকের কাজের মতোই।

তোমরা কি কমিক্স পড়েছো? যাকে বলা যায়, চিত্রে কাহিনী। 16, 20 বা 24টি ছবিতে যেখানে বলা হয়েছে একটি গল্প। প্রায় একই কায়দায় সিনেমার গল্পও ভাগ করা হয়ে থাকে কতকগুলি ঘটনায়। দৃশ্যে, সটে। একটি কমিক্স-এর খরচ বড় জোর একটি টাকা, কিন্তু সিনেমা করতে খরচ কম করেও দশ লক্ষ কিংবা তারও বেশি টাকা। টাকার ফারাক যাই হোক, পদ্ধতিটা কিন্তু একই।

তোমরা কি সচল সচিত্র গল্পের বই নিয়ে খেলেছ? ঐ সব বইয়ের প্রত্যেক পাতায় আঁকা ছবিগুলি মনে হয় একই রকমের দেখতে। খুব কাছের থেকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলে দেখতে পাবে এমনিতে একই রকমের দেখতে লাগলেও একটা ছবি থেকে আর একটা ছবিতে সামান্য পার্থক্য রয়েছে—হাত আর পা একটু একটু সরানো। পর পর এইরকম সামান্য পার্থক্য রেখে ছবিগুলি আঁকা হয়েছে। এখন তোমরা এই বইয়ের পাতাগুলো দ্রুত সরাতে থাকলে দেখবে নিশ্চয় ছবি সচল হয়ে উঠেছে। যেন ছবিতে আঁকা মানুষটা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তখন আর ঐ ছবিগুলো অনেক ছবি দিয়ে গাঁথা ছবির মালা নয়, বরং একটি সচল ছবি।

পদ্ধতিগত দিক থেকে ঐ সচিত্র গল্প বইয়ের পাতা দ্রুত ওলটানোর জন্য তোমাদের হাতের আঙ্গুল যে কাজটি করল, সিনেমার প্রোজেকটারও তাই



করে থাকে। পর্দার বুকে একের পর এক ছবি প্রতিফলিত হয়ে থাকে সমান গতিবেগ রক্ষা করে। আর তখনই মনে হয়, ফিল্মের স্থির চিত্রগুলি পর্দায় সচল হয়ে উঠেছে। গতিবেগের একটা হিসেব আছে। প্রতি সেকেণ্ডে 24টি ছবি ( ফ্রেম )।

ফিল্মের ক্যামেরা সাধারণ ক্যামেরার মতোই। বক্সের ক্যামেরার সঙ্গে পার্থক্য সামান্যই। ফিল্মের ক্যামেরা দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে পর পর 24টি ছবি তোলা যেতে পারে একটা লম্বা ফিল্ম-ফিতেয়। একটানা অনেক ছবি তোলার সময়, একটি ছবি তোলা হলেই পরবর্তী ছবির ফ্রেম আপনিই এসে হাজির হয়। এই ভাবে প্রত্যেকটি ছবির জন্য ফ্রেম পর পর এগিয়ে যায়।

সমস্ত ফিল্মে ছবি তোলা হয়ে গেলে, সেই লম্বা ফিল্ম-ফিতে ( রীল ) প্রজেকটারের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে থাকে সেই একই গতিতে, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে 24টি ছবি বা ফ্রেম। একটি ফ্রেম শেষ হলে অনুমাত্র সময়ে দ্বিতীয় ফ্রেম হাজির হয় আলোকরশ্মির সামনে এবং একই পদ্ধতিতে ছবি ভেসে ওঠে পর্দার বুকে। ফিল্ম-ফিতে এত দ্রুত গতিতে চলতে থাকে যে দু'টি ফ্রেমের ছবি প্রদর্শনের মাঝখানে অনুমাত্র সময়ের ব্যবধান চোখেই পড়ে না। বরং মনে হয়, গোটা ছবিটা একটানা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। ফিল্ম-ফিতে বা রীলের চলনটা সেলাই কলে একটানা সুতো চলার মতোই।

ছবিকে সপ্রাণ করে তোলার পদ্ধতি কিছুটা জটিল বটে, কিন্তু এতে মজাও আছে। শিক্ষনীয় তো বটেই। মনে হয় যাদু, কিন্তু যাদু বলতে বোঝায় এর বিজ্ঞান ও কারিগরির দিকটাকে। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ণ শাস্ত্রের মূল নিয়ম-নীতিকেই এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। তোমরা যদি জানতে পারো কি ভাবে সিনেমা তৈরি হয়, তাহলে সিনেমা দেখার আনন্দ আরও বেশি পাবে।

কিন্তু সিনেমা তৈরি হওয়ার আগে চিত্রনাট্য লেখা হওয়া চাই। চিত্রনাট্য লেখার আগে সিনেমা করার কথা ভাবেন পরিচালক। আর গল্পের ভাবনা লেখকের।

সিনেমা তৈরি হয় যন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু যন্ত্র সেই কাজই করতে পারে যা মানুষের মন ও মনন করতে চায়।



জিপ গাড়ি থেকে শুটিং

# একদা এক

একদা এক রাজা ছিল ... ...

তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের ঠাকুমা, দিদিমা বা মা কিংবা কাকিমা, জ্যেঠাইমাদের কাছে গল্প শুনেছ, যার শুরু ঐ ভাবে।

সেই রাজার ছিল সাতটি সুন্দরী মেয়ে অথবা একটি ছেলে। রাজপুত্র এক দুর্ধর্ষ অভিযাত্রী। সাদা ঘোড়ায় চড়ে সে চলেছে গভীর বনের মধ্য দিয়ে। সে চলেছে বন্দিনী রাজকন্যাকে কালো দৈত্যের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতে...

গল্প রাজা আর রাজকুমারীদের নিয়ে, পরী আর দৈত্যদের সম্পর্কে কিংবা উড়ন্ত কার্পেট ও পক্ষীরাজ ঘোড়ার। কখনও কখনও গল্প হতে পারে সাধারণ মানুষদের নিয়ে, বাচ্চাদের নিয়ে।

তোমরা এইসব গল্প পড়ো তোমাদের পাঠ্য বইয়ে, গল্পের বইয়ে, উপন্যাসে। তোমাদের পড়া গল্প মঞ্চে নাটক হতেও দেখো।

সিনেমা হ'ল সর্বাধুনিক মাধ্যম, যার সাহায্যে এক সঙ্গে হাজার হাজার লোকের সামনে গল্প বলা যায়।

কিন্তু সবার আগে একজনকে একটা গল্পের কথা ভাবতে হয়।

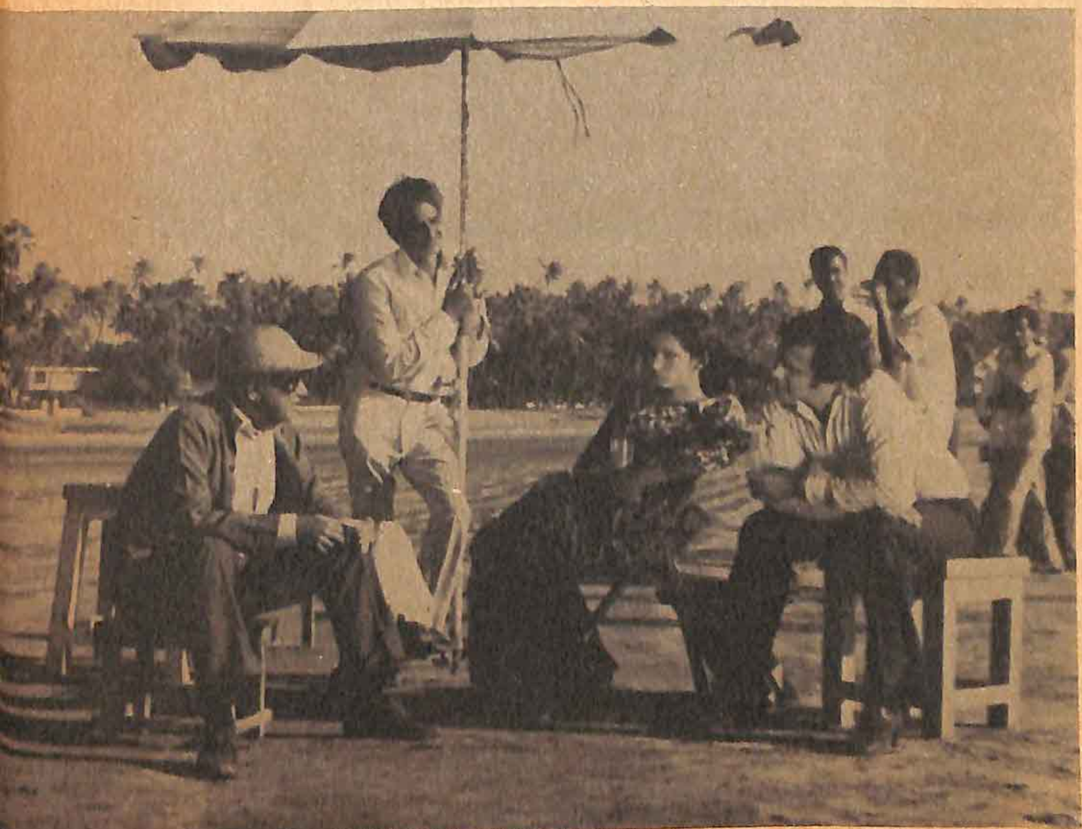
তাঁকে বলা হয় গল্প লেখক।

তিনি একটা পুরো গল্প লিখতেও পারেন অথবা গল্পের একটা খসড়াও করতে পারেন।

লেখক যে গল্পটি লিখবেন সেটা মৌলিক গল্প হতে পারে অথবা লেখক গল্পের বিষয়বস্তু অন্য কোন বই থেকে ধার করতে পারেন। একটি প্রকাশিত গল্প বা নাটকও নেওয়া যেতে পারে কিংবা লেখক বিদেশী কোন সিনেমা থেকে গল্পটা 'চুরি' করতে পারেন।

যেভাবেই হোক না কেন, লেখক তার গল্প বা গল্পের খসড়াটি দেবেন প্রযোজক অথবা পরিচালকের হাতে। ঐ গল্পটি নিয়ে সিনেমা করা যায় কিনা তা নিয়ে ওঁরা আলোচনা করে দেখবেন। ওঁদের আলোচনার মূল বিষয়টা অবশ্যই সেই গল্প হাজার হাজার সিনেমা দর্শক পছন্দ করবে কিনা তা। যদি ওঁদের গল্পটি পছন্দ হয়, ওঁরা ঐ গল্প নিয়ে ছবি করতে রাজি

অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে পরিচালক



থাকেন, তাহলে ওঁরা তখন গল্পটি দেবেন চিত্রনাট্য রচয়িতার কাছে। চিত্রনাট্য রচয়িতা একজনও হতে পারেন, একাধিকও হতে পারেন। পরিচালক নিজেই চিত্রনাট্য রচনা করতে পারেন, আবার অন্য কোন লেখকও সে দায়িত্ব নিতে পারেন। অবশ্য যাঁর এ সম্পর্কে বিস্তর অভিজ্ঞতা রয়েছে, তিনিই সেটা করবেন।

রূপোলি পর্দায় গল্পটিকে যেভাবে দেখানো হবে, তা ভেবে নিয়ে চিত্রনাট্যকার গল্পটিকে ঘটনা পরম্পরায় সাজান, দৃশ্যে দৃশ্যে ভাগ করেন এবং এই প্রক্রিয়ায় চিত্রনাট্য এক সময় সম্পূর্ণ করেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি অবশ্যই পরিচালকের সঙ্গে পরামর্শ করে থাকেন।

চিত্রনাট্যও নাটকের মতো, তবে কিনা, রূপোলি পর্দায় কি প্রয়োজন আর কি নয়, সেই কথা মনে রেখে এই নাটক লেখা হয়ে থাকে। চিত্রনাট্যকারকে মনে রাখতে হয়, পর্দার ঘটনাপ্রবাহ কিভাবে প্রদর্শিত হবে, দৃশ্যগুলি কোনটির পর কোনটি কেমন ভাবে আসবে, কখন কোন চরিত্র হাজির হবে, তার কি কাজ হবে।

চিত্রনাট্যটি পরিচালকের অথবা পরিচালক-প্রযোজকের পছন্দ হলে অতঃপর তা পাঠিয়ে দেওয়া হয় সংলাপ রচয়িতার কাছে।

অন্যান্য দেশে চিত্রনাট্যকারই সংলাপ রচনা করে থাকেন। কিন্তু ভারতে প্রায় ক্ষেত্রেই চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ রচয়িতা ভিন্ন ব্যক্তি। যেমন একটা ছবি হচ্ছে হিন্দিতে কিন্তু এই ছবির সংলাপ রচয়িতা তার লেখক নাও হতে পারেন। চিত্রনাট্যগুলি প্রায়ই লেখা হয় ইংরাজীতে যাতে প্রযোজক (তিনি হয়তো পাঞ্জাবী), পরিচালক (তিনি হয়তো তামিলভাষী), ক্যামেরাম্যান (তিনি হয়তো বাঙ্গালী), শব্দযন্ত্রী (তিনি হয়তো পারসি ভাষায় কথা বলেন), নায়ক (হয়তো তিনি পাঞ্জাবী বা উত্তরপ্রদেশী বা বিহারী), এবং নায়িকা (হতে পারেন তিনি তামিলভাষী, অথবা অন্ধ্রপ্রদেশের মেয়ে কিংবা সিন্ধী) এঁদের সকলের পক্ষেই বোঝার সুবিধা হয়।

যাই হোক ভারতে প্রথম দিন থেকেই বিশেষ করে হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে সংলাপ রচয়িতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংলাপ রচয়িতাকে পৌরাণিক



পৌরাণিক চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য

ছবির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয়, সংস্কৃত ঘেঁষা হিন্দি, মুঘল আমলের পটভূমিকায় লেখা কোন কাহিনীর ক্ষেত্রে পারসি মিশ্রিত উর্দু এবং হাল আমলের ছবির ক্ষেত্রে আপামর সকলের জন্য সহজবোধ্য বহুল ব্যবহৃত হিন্দি। ভাষার রকমফের যাই হোক, ভাষায় সেই চাকচিক্য বা স্বাদ সংলাপে রাখতেই হবে যাতে দর্শক-শ্রোতার দল নায়ক-নায়িকার কথাবার্তায় আকর্ষণ বোধ করে। ছায়াছবিতে সংলাপের সূত্রেই সাহিত্যের সম্পর্ক।

কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন পরিচালক ও প্রযোজক একই ব্যক্তি, তেমনি চিত্র নাট্যকার ও সংলাপ রচয়িতাও হতে পারেন একই ব্যক্তি। তবে আমি দু'জনকে আলাদা আলাদা মানুষ হিসাবে দেখিয়েছি তোমাদের কাছে এইজন্যে যে, এর দ্বারা চিত্রনাট্য ও সংলাপ—ছবি তৈরির কর্মকাণ্ডে দু'টি বিষয়েরই গুরুত্ব ভালোভাবে বোঝানো যাবে।

ভারতে সিনেমায় সঙ্গীত একটা আবশ্যিক ব্যাপার। আর সেইজন্যেই গীতিকার ও সঙ্গীত পরিচালকের গুরুত্বও অত্যন্ত বেশি। নাচ গানের দৃশ্যের স্যুটিং (ছবিতোলা) শুরু হওয়ার আগেই গান লেখা ও তাতে সুর সংযোজনের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে।

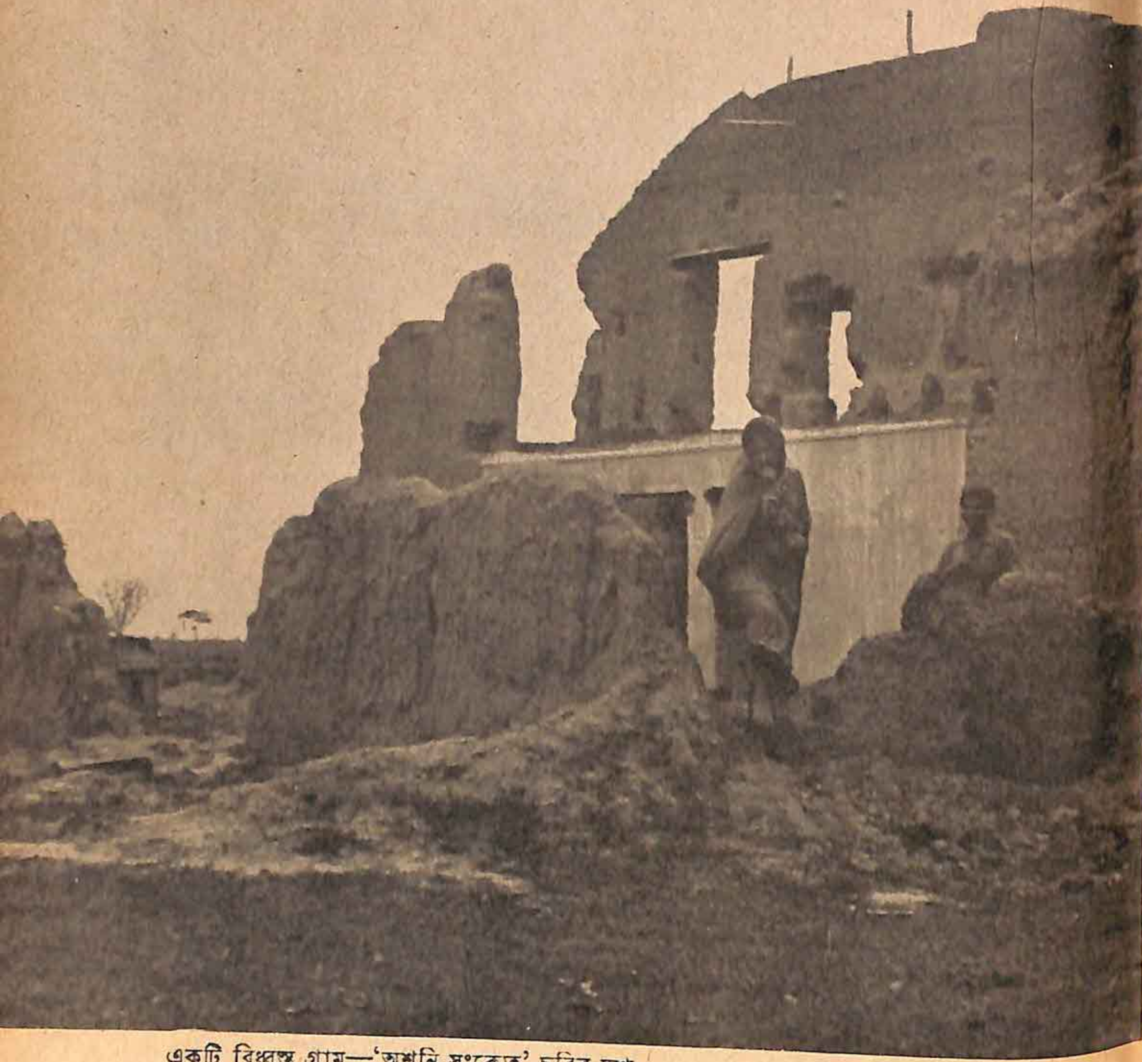
যখন একথা সুনিশ্চিত যে, প্রযোজক একটি ছায়াছবি করছেন তখন এ সবই হবে। ছবিটির স্যুটিং হতে পারে স্টুডিওর ভেতরে কিংবা কোন বাড়িতে অথবা বাইরে খোলা আকাশের নিচে কোথাও। খুব কাছ থেকে নিজের চোখে ছবি তোলার ব্যাপারটা দেখা দরকার। তার জন্যে আমরা যাবো স্টুডিওতে এবং আউটডোর স্যুটিং-এ।



# আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ

কোন স্টুডিওর সদর দরজা পার হয়ে ভেতরে ঢোকা মাত্রই তোমার প্রথমে মনে হবে, কেমন যেন হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড চলছে।

লোকজন ছুটোছুটি করছে এদিক ওদিক। পোশাক আশাক এমন পরেছে যেন কোন উৎসবে যোগ দিতে এসেছে সবই। জিপসি নর্তকীর পোষাক পরে আছে কেউ। কেউ সেজেছে সারকাসের ক্লাউন, পুলিশ কনসটেবল, অফিসার। কালো গাউন পরে উকিল মোক্তার। রঙচঙে ঘাগরায় ক্যাবারে নর্তকী। হিংস্র চোখ গুণ্ডার দল। এরা সকলেই অপ্রধান অভিনেতা অভিনেত্রী যাদের চলতি কথায় বলা হয় একস্ট্রা। একটি ছবির উজ্জ্বলতা বাড়াতে, পরিবেশকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে ভিড়ের দৃশ্যে উত্তেজনা বাড়াতে এরা কিন্তু ফালতু নয় মোটেই। অথচ তোমরা যদি জানতে, প্রতিদিনের কাজের জন্য এরা কত কম পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে এবং মাসের মধ্যে সামান্য ক'টা দিনই বা এদের কাজ জোটে, তাহলে বুঝতে পারবে এদের মুখ কেন এত মলিন দেখায়। পরবর্তী কোন ছবিতে ভীড়ের দৃশ্যে এদের দেখে হয়তো তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে যে এরাও হাসতে জানে, গাইতে জানে, নাচতে জানে। পরিচালকের নির্দেশে এরা এই সব করে থাকে।



একটি বিধ্বস্ত গ্রাম—'অশনি সংকেত' ছবির দৃশ্য



অন্যদিকে দেখতে পাবে স্টুডিওর মধ্যে কয়েকজন ক্যামেরা বয়ে নিয়ে চলেছে। আলো নিয়ে যাচ্ছে। ট্রলি ঠেলছে। প্লাইউড ফ্রেমের উপর ক্যানভাসে আঁকা প্রয়োজনীয় দৃশ্যাবলী সাজানো হচ্ছে। ট্রাঙ্ক থেকে তুলে আনা হচ্ছে নানা আসবাবপত্র। এবার অপর একদিকে চোখ ফেরাও। মেকআপ রুম থেকে নায়ক-নায়িকা বের হয়ে এলো। ছুটে গেল ষ্টুডিও ফ্লোরে। এসো আমরা তাকে ( নায়ক বা নায়িকা ) লক্ষ্য করি।

তোমরা নিশ্চয়ই আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ গল্পটি পড়েছো। আলাদীন যেই না প্রদীপটা মাটিতে ঘষলো, অমনি হাজির হলো জিন। সে চাইলো, কাজ দাও।

আমার জন্য একটা প্রাসাদ বানাও, আলাদীন হুকুম করলো। আর মুহূর্তের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল আশ্চর্য সুন্দর বিশাল প্রাসাদ…

প্রাসাদে থাকতে থাকতে আলাদীন হাঁপিয়ে উঠলো। তখন হুকুম দিলো, নিয়ে যাও এই প্রাসাদ। বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

আর্ট ডিরেক্টার যিনি স্টুডিও সেট তৈরির পরিকল্পনা করেন, তদারকি করেন, তিনি এবং তার সহকর্মীরা বলতে গেলে আশ্চর্য প্রদীপ গল্পের ঐ জিনের মতোই অদ্ভুতকর্মা। ওরা একদিনে একটি প্রাসাদ বানাতে পারেন

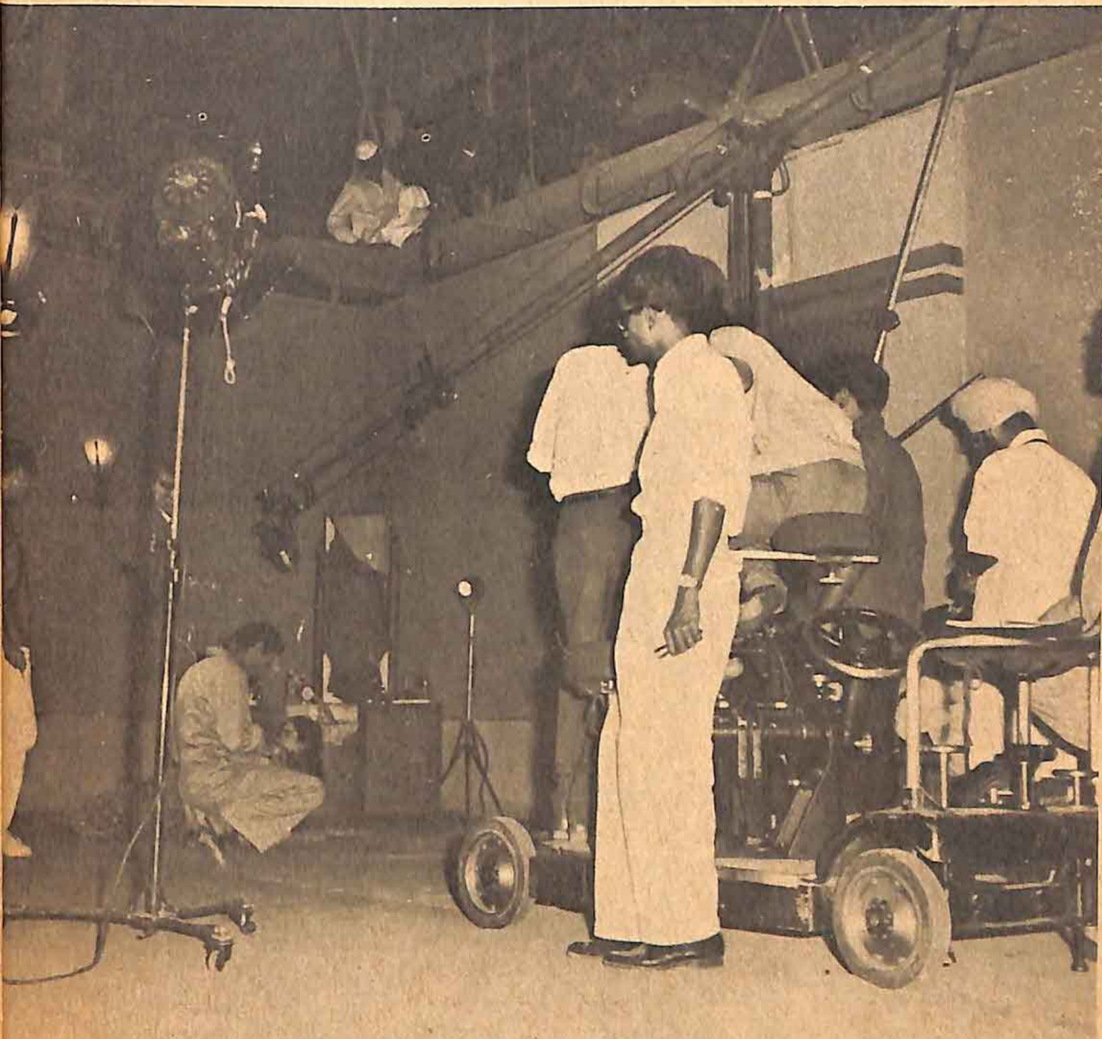
আবার পরের দিন তা ভেঙ্গে ফেলতেও পারেন। এক রাত্রিতে গড়ে তুলতে পারেন ধনীর অট্টালিকা কিম্বা গরিবের কুঁড়ে ঘর।

তোমরা সিনেমায় প্রায়ই বিরাট হলঘর দেখতে পাও, যা দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বিরাট স্তম্ভের উপর ভর দিয়ে। দেখে অবাক হতে হয়, আর মনে হয় এর জন্য কত খরচই না হয়েছে। কিন্তু এখন স্টুডিওর মধ্যে দেখতে পাচ্ছো মারবেল পাথরের ঐ স্তম্ভগুলি আসলে প্লাইউডের তৈরি। ভেতরটা ফাঁপা। গায়ে জড়ানো মারবেল পাথরের নক্সা-ছাপা কাগজ। বিশাল দেয়ালগুলি আসলে কাঠের ফ্রেমের ( ফ্লাটও বলা হয় ) উপরে কাপড় মুড়ে দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। দরজাগুলি তৈরি হয়েছে পাতলা ফিনফিনে প্লাইউডের চাদরে।

সেটটি ধরা যাক ধনী ব্যক্তির বাড়ির ঝকঝকে তকতকে আধুনিক রুচি-সম্মত ড্রইং রুম। সুদৃশ্য ঘোরালো সিঁড়ি, যা নাকি বারান্দা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। মাথার উপরে হয়তো কিছুই নেই। এইসব আপাত সুদৃশ্য সাজসজ্জার আড়ালে আছে মাচান, মই, ক্যামেরা বহনকারী ক্রেন কিংবা ভাঙা দেয়াল, স্তম্ভ, দরজা জানালার যাবতীয় পরিত্যক্ত জিনিসপত্র।

তোমরা হয়তো দেখতে থাকবে সূর্যাস্তের দৃশ্য। লাল আর কমলা রঙের আলোর খেলায় যা সুন্দর দেখায়। এটা আর কিছুই নয়। দূরের একটি পর্দা, যে পর্দা স্টুডিওর দেয়ালের আগাগোড়া জুড়ে রয়েছে—তাকেই সূর্যাস্তের রঙে রাঙ্গানো হয়েছে।

সেট তৈরি হয়ে গেলে, নায়ক-নায়িকা সেটে উপস্থিত হলে ছোট বড় আলোর সাহায্যে বলতে গেলে গোটা পরিবেশটাকেই আলোকোজ্জ্বল করে তোলা হয়। চারপাশে উপস্থিত পরিচালক, প্রধান ক্যামেরাম্যান ও তার সহকর্মী, সাউণ্ড ইনজিনীয়ারের সহকারী। সাউণ্ড ইনজিনীয়ারের সহকারী থাকেন রেকর্ডিং বুথের বাইরে। তাঁর হাতে আছে একটি মাইক্রোফোন। মাইক্রোফোনের নিচের অংশ বুম-এর সঙ্গে যুক্ত। এই বুমের সাহায্যে মাইক্রোফোন এগিয়ে পিছিয়ে আনা যায়। বুম বসানো থাকে একটি তেপায়ার উপর। তেপায়াটির পায়ার সঙ্গে আছে চাকা,



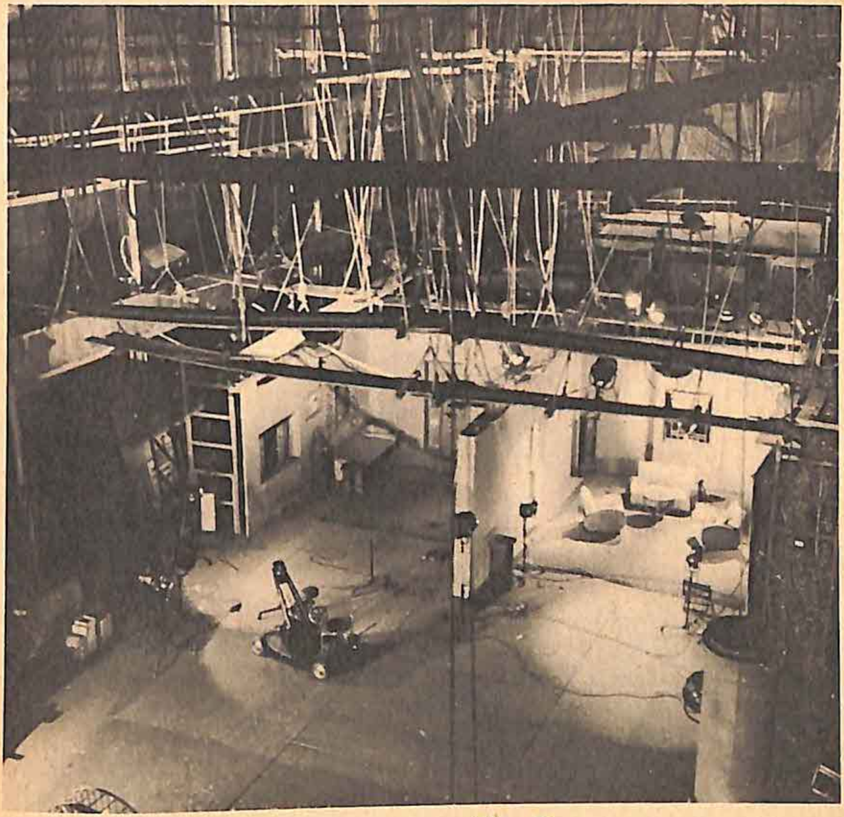
ট্রিপয়ের ওপরে 'বুম'

সুবিধামতো এদিকে ওদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বুমের প্রয়োজন এই জন্য যে, নায়ক-নায়িকারা যেখান থেকেই কথা বলুক না কেন, এগিয়ে পিছিয়ে নিয়ে যাতে তাদের বলা কথাগুলি বা সংলাপ রেকর্ড করে নেওয়া যায়। অবশ্যই মাইক্রোফোন এমনভাবে রাখতে হবে যা নাকি ক্যামেরার দৃষ্টির নাগালের বাইরে থাকে।

সেটের দেয়ালের অনেক ওপরে স্টুডিওর সিলিংয়ের কাছাকাছি শক্ত দড়ি দিয়ে ঝোলানো থাকে মাচান, ঐ মাচানের উপর নিচের দিকে স্টুডিও ফ্লোরের দিকে মুখ করে রাখা যে বড় বড় আলোগুলি, ঐ আলোর সাহায্যে গোটা সেটটা আলোকিত হয়ে ওঠে। আলোকরশ্মির তীব্রতা অনুযায়ী কয়েক ধরনের আলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন টেন কে ( 10 কিলো-ওয়াট ) ফাইভ কে ( 5 কিলোওয়াট ), সোলার ( 2 কিলোওয়াট )। মাটি থেকেও আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয় নায়ক-নায়িকার মুখের উপর। সে সব আলোর তীব্রতা সাধারণত সোলার বা বেবি ( 1 কিলোওয়াট )।

ক্যামেরাম্যান বা তার সহকর্মীদের নির্দেশে যারা এই সব আলোগুলি ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেয়, সেই সব চটপটে কর্মীদের বলা হয় লাইট কুলি। প্রতিদিনিই ওরা মই ছাড়া কেবল দড়ি বেয়ে বেয়ে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে উঁচুতে বাঁধা মাচানে উঠে যায়, আবার নেমে আসে। মাচান থেকে কারো বা কোন কিছুর সাহায্য না নিয়েই অদ্ভুত কৌশলে পৌঁছে যাচ্ছে আর একটা মাচানে। প্রতি পদক্ষেপেই মৃত্যুভয়। কখনও কখনও দুর্ঘটনা হয়ে ওঠে মর্মান্তিক। পরে যখন তোমরা সিনেমায় একটি আলোক দৃশ্য দেখবে, তখন মনে পড়বে ওরা তোমাদের আনন্দ দিতে গিয়ে কত বড় ঝুঁকি নিয়ে থাকে।

ঐসব কর্মী, ওদের নাম কুলি হলেও, ওরা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। একটি দৃশ্য সুন্দর করে তুলতে, নায়ক-নায়িকাদের মুখের উজ্জ্বলতা বাড়াতে নির্ভর করে আলোকসম্পাত সঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা তার ওপরে। এটা হাতের কাজ। কোথা থেকে কি ভাবে কতটুকু আলো ফেলতে হবে, সেটাই আসল কাজ। আয়োজন যারা করে, সিনেমার



লাইট-কুলিদের চলাফেরার জায়গা

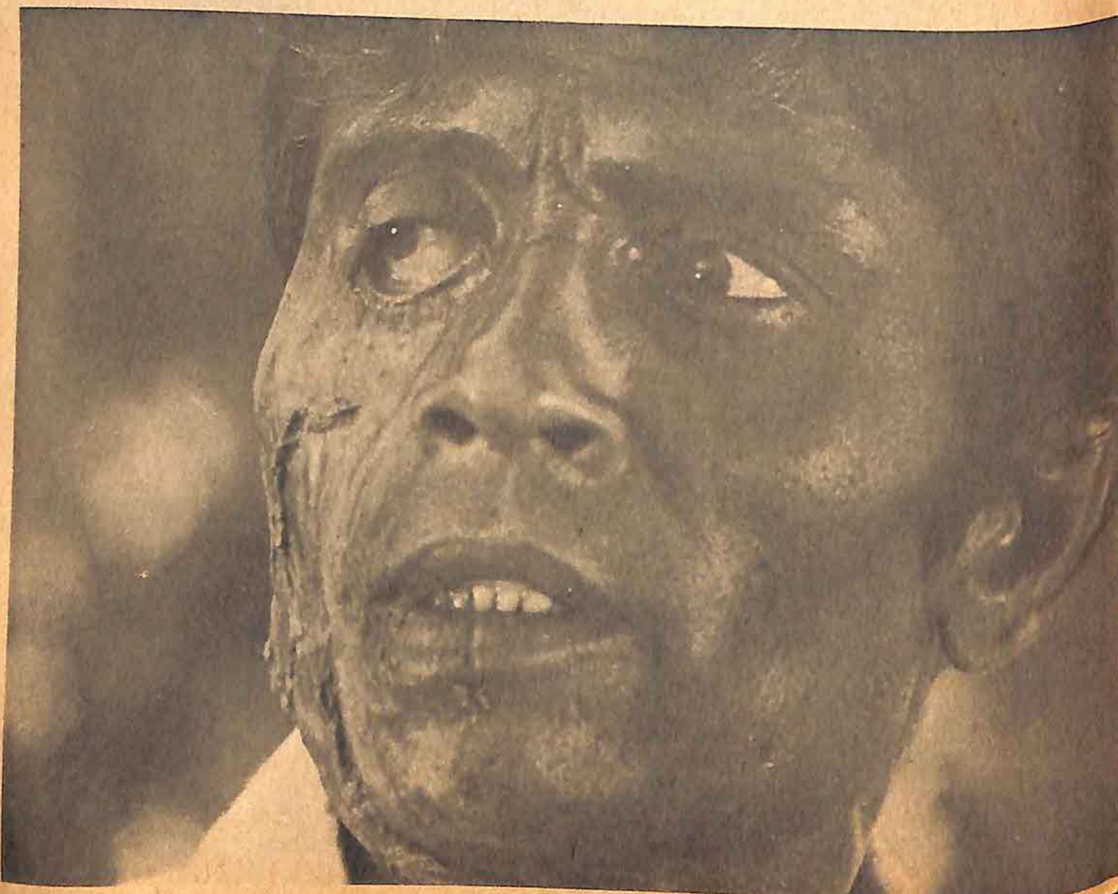
পরিচয় পত্রে তাদের নাম থাকে না, পারিশ্রমিকও যৎসামান্য। ওরা উপেক্ষিতের দলে।

আলোগুলি যখন ঠিকঠাক বসানোর কাজ শেষ পর্যায়ে, তখন অন্যদিকে মেকআপ ম্যান নায়ক-নায়িকা বা অন্যদের সাজসজ্জার কাজটা দ্রুত সেরে ফেলছে। মেকআপ এখানে যে রকমটা হয়ে থাকে তা আসলে তোমাদের স্কুলের নাটকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য মেকআপের যে আয়োজন তার থেকে নিশ্চয়ই আরও বড় মাপের। ব্যাপারটা কিন্তু একই। একটা বড় তফাৎ হলো, নাটকে একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী মেকআপ নেন গোটা নাটকটার জন্যই। নাটকের যবনিকা না পড়া পর্যন্ত তাঁকে অভিনয়

করে যেতে হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মেকআপ করা হয়ে থাকে। সিনেমায় কিন্তু মেকআপ দেওয়া হয়ে থাকে একটি দৃশ্যাংশের কথা মনে রেখে, যাকে বলা হয় শট। একটা শট একাধিকবার নেওয়া হতে পারে নানা রকম ভাবে।

ছায়াছবির যাদুমহলে আর একটি যাদু হলো মেকআপ। ধরো একজন অভিনেত্রীর গায়ের রঙ কালো। কিন্তু ছবিতে দেখলে তার মুখখানার রঙ যেন দুধে আলতায়। এটা সম্ভব হয় মেকআপ ম্যানের শিল্পকলার গুণে। এমন সব প্রসাধন ব্যবহার করা হয়, রঙ লাগানো হয়, অঙ্গরাগ চূর্ণ লেপন করা হয় যে, কালো হয়ে ওঠে গোলাপী। অবশ্য নায়িকার সুন্দর মুখের আলোক চিত্রের জন্য মেকআপের সঙ্গে আছে আলোকসম্পাত

মেক-আপের যাদু

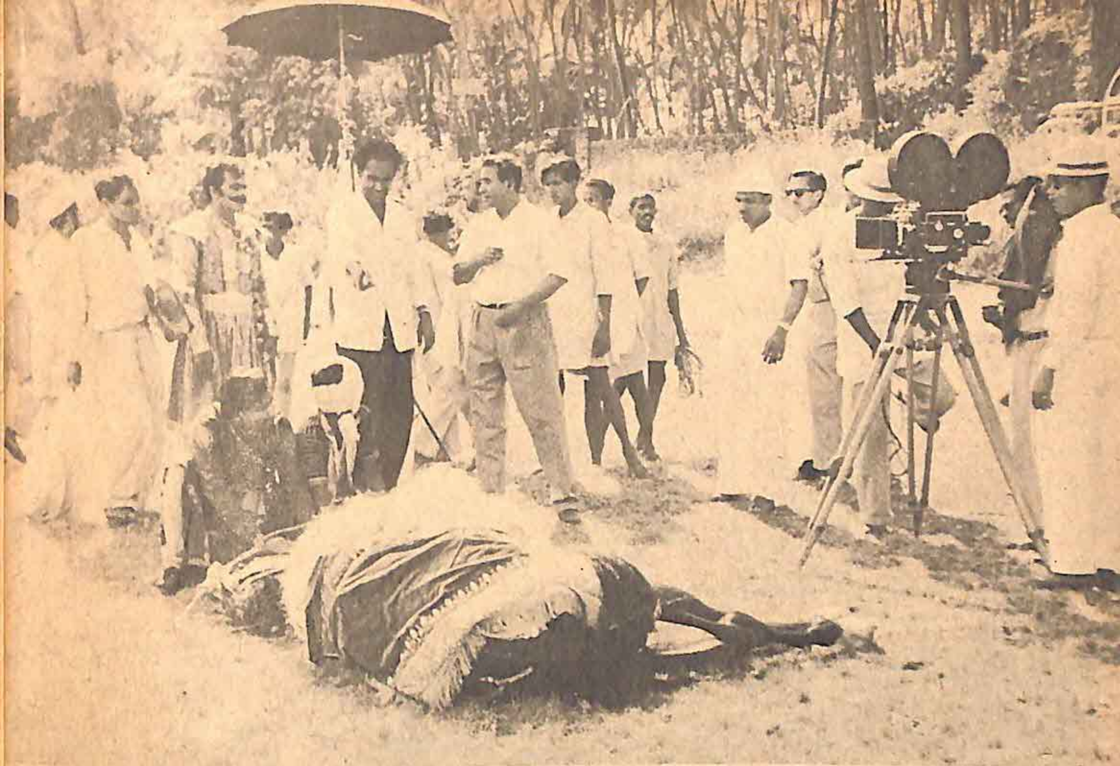


ও ফটোগ্রাফির কেরামতি। ফলে অনেকের এমন একটা ধারণা আছে যে, নায়ক-নায়িকার সৌন্দর্যের মূলে সাজসজ্জার এই পারিপাট্যই প্রধান কারণ। স্টুডিও ছেড়ে আসার আগে তোমাদের প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাজেরও প্রশংসা করতে হবে। ওঁদেরকেও চোখ ধাঁধানো আলোর সামনে দাঁড়িয়ে গরমের মধ্যে একটানা অভিনয় করে যেতে হয়।

এখন স্টুডিওর বাইরে যেতে পারলে তোমরা খুশিই হবে। কেননা, ভেতরটা অত্যন্ত গরম। চারদিকে নিচ্ছিদ্র দেয়াল। আলোর উত্তাপে বাতাস উষ্ণ। আজকের সেটটি হলো একটি ধনী গৃহের ড্রইং রুম। রাত্রেই সেট নির্মাতারা এই সেটটি ভেঙে ফেলবে। কালকেই হয়তো সম্পূর্ণ অন্যরকম একটি সেট তৈরি করবে—হয়তো কোন দস্যুদলের আস্তানা। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের সেই জীন অথবা সিনেমার এই যাদুকররা গড়ছে ভাঙছে একই সঙ্গে প্রাসাদ বা রূপকথার রমণীয় উদ্যান কিংবা গরীবের কুঁড়ে বা চালাঘর। সিনেমা আসলে, তাই, যা মানুষ নিজেই গড়ে তোলে।

# সমুদ্রতীরে পিকনিক

একটা ছবির সব শুটিংই কিন্তু স্টুডিওর ভেতরে হয় না। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেও অনেক দৃশ্য তোলা হয়ে থাকে। ইদানীং অল্প খরচে তোলা ছবির প্রযোজকরা ইনডোর স্যুটিংগুলিও স্টুডিওর বাইরে কোন বাংলোয় বা ফ্ল্যাট বা অফিস বাড়ীতে করা পছন্দ করছেন। এই ভাবে ওরা স্টুডিও ভাড়া ও স্টুডিওর মধ্যে সেট তৈরির খরচ কমাতে চান। কেউই অবশ্য তাঁদের বাংলো ও ফ্ল্যাটগুলি বিনামূল্যে ব্যবহার করতে দেন না, কিন্তু এগুলির ভাড়া তেমন বেশি নয়। স্টুডিওর বাইরে স্যুটিং করার ঝোঁক বাড়ায় সিনেমা নির্মাতাদের কাছে হালকা ক্যামেরা, এলুমিনিয়াম লাইট, বহনযোগ্য জেনারেটার ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তবে কারিগরির দিক থেকে নিখুঁত ব্যবস্থা চাইলে ভাড়া করা বাড়ি থেকে স্টুডিওতেই তা বেশি করে পাওয়া যাবে। ফ্ল্যাট বাড়িতে অতিরিক্ত জায়গা থাকে না শুটিং-এর জন্য, যেখানে ক্যামেরা ও লাইট সুবিধা মতো রাখা যেতে পারে, ঘরের সিলিং খুব উঁচু নয় বলে মাথার উপর বড় আলোর ব্যবস্থা করার সুযোগ কম, অথচ আলোর প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই রয়েছে। সাউণ্ড প্রুফ স্টুডিওতে শব্দগ্রহণ যতটা নির্বিঘ্নে ও নিখুঁত ভাবে হতে



আউটডোর শুটিং

পারে বাইরের বাংলোয় বা ফ্ল্যাটে বা অফিস বাড়িতে তা হওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্যই বাইরে রেকর্ড করা সংলাপের অধিকাংশই ডাবিং করতে হয় বা রি-রেকর্ড করতে হয়।

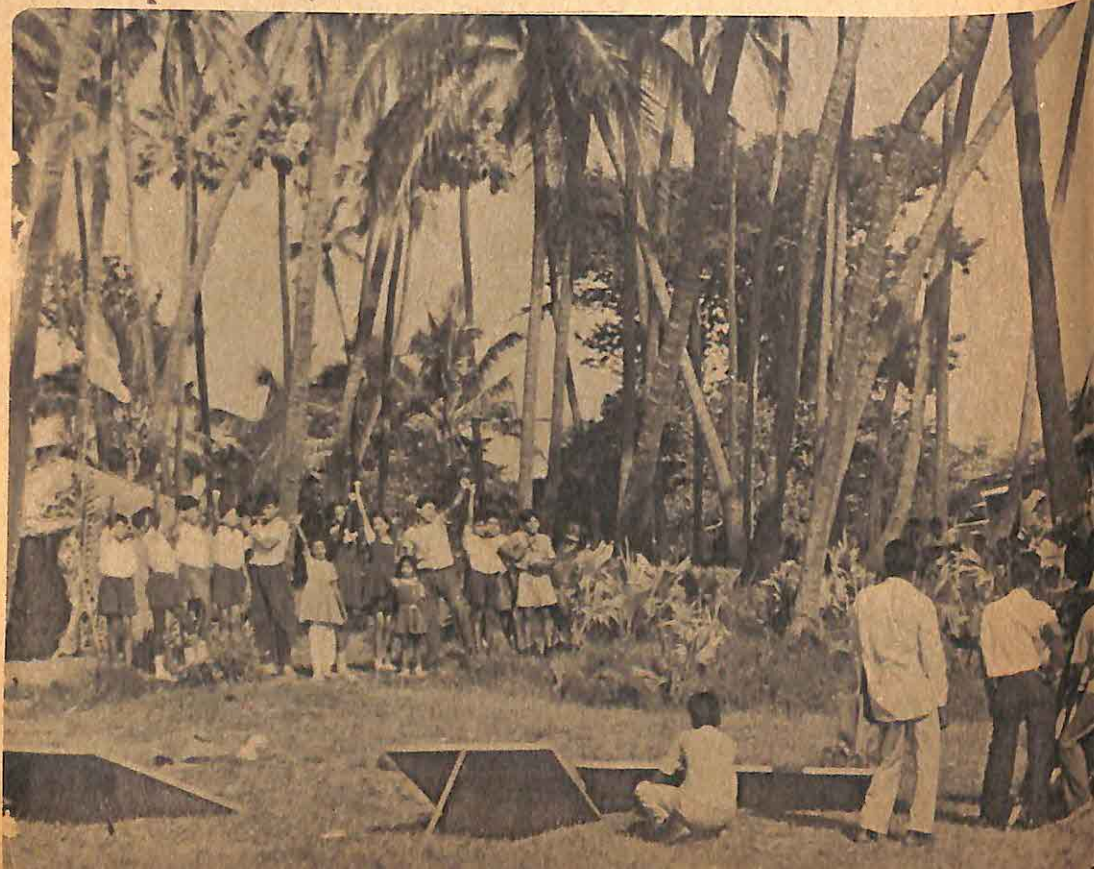
বড় প্রযোজক যিনি স্টুডিওতে শুটিং করাই পছন্দ করেন, কিংবা অল্প বাজেটের প্রযোজক, যিনি বাইরে কোন বাংলোর বা ফ্ল্যাট বাড়িতে শুটিং করা পছন্দ করেন, এঁদের সকলকেই কিন্তু অনেকগুলি দৃশ্য গ্রহণ করতে হয় প্রাকৃতিক পরিবেশে, সূর্যালোকে। এই সব দৃশ্যের মধ্যে আছে তুষারাবৃত পর্বতমালা, সমুদ্রতীর, দুরন্ত গতি ট্রেন, নায়ক-নায়িকার অথবা দস্যুদলের গভীর বনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ার পিঠে ছুটে যাওয়া—এই রকম কত কি। এই ধরনের দৃশ্য স্টুডিওর ভিতর তৈরী করা যায় না। প্রযোজকরা এখন ক্রমেই যত বেশি সম্ভব শিল্পী ও টেকনিশিয়ানদের নিয়ে যন্ত্রপাতি সহ ছুটে যাচ্ছেন কাশ্মীর এবং কুলু, নৈনিতাল এবং মুসৌরি

উটকামণ্ড ও কুন্নুর। কখনও কখনও চলে যাচ্ছেন হিমালয় পেরিয়ে নেপাল কিংবা আফগানিস্থানে।

কিন্তু আমরা যদি বোম্বাই থেকে একদিনের দূরত্বে কোথাও আউটডোর শুটিং দেখতে যেতে চাই, তাহলে আমাদের প্রথমে ধরতে হবে ট্রেন। ট্রেনে করে মালাদ। সেখান থেকে বাসে করে যাব আইল্যানণ্ড। নামে আইল্যাণ্ড হলেও এটা সত্যিই কোন দ্বীপ নয়, আসলে সুন্দর একটি সমুদ্র সৈকত।

গোটা তীরভূমি জুড়ে সারি সারি পাইন গাছ। সমুদ্র থেকে খুব দূরে নয়—এমন জায়গায় রয়েছে একটি পুরোনো গীর্জা। পিকনিক পারটির সুবিধার জন্য কয়েকটি সুন্দর বাংলো। শিল্পীদের জন্য ঐ বাংলো ভাড়া নেওয়া যেতে পারে। পোষাক পরতে হবে। মেকআপ নিতে হবে।

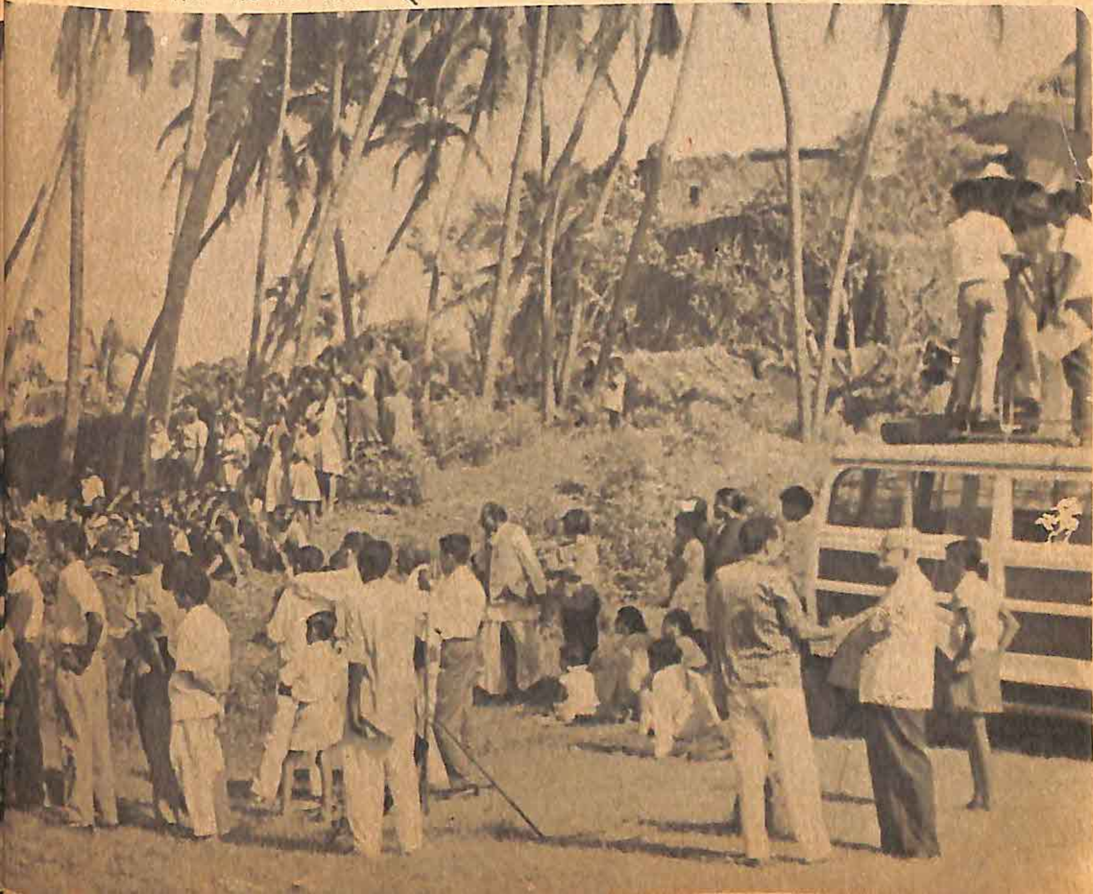
'মধ' দ্বীপে শুটিং



লাঞ্চের সময় বিশ্রাম নেওয়ারও দরকার আছে। বিশ্রামের সময়টা বলতে কি, সমুদ্রতীরে চমৎকার পিকনিক হতে পারে।

হু'টো বড় বড় ট্রাক আর কয়েকটি গাড়ি পাইন গাছের ছায়ায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলির একটি হলো সাউণ্ড ট্রাক। এতে আনা হয়েছে নানা যন্ত্রপাতি। তারমধ্যে আছে ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, প্লে-ব্যাক মেশিন, ক্যামেরা, ট্রলি, রিফ্লেকটার্স।

রিফ্লেকটার্স হচ্ছে বড় ও ছোট মাপের কয়েকটি কাঠের বোর্ড, রূপোলি কাগজে বোর্ডগুলি মুড়ে নেওয়া হয়েছে। সূর্যালোক ঐ বোর্ডে এসে পড়লে তার থেকে আলো প্রতিফলিত হয়। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের লক্ষ্য করে ঐ আলোর প্রতিফলন ব্যবহার করা হয় ক্যামেরার পক্ষে প্রয়োজনীয় আলোর ঘাটতি পূরণ করার জন্য। অন্য আর একটি ট্রাকে আনা



হয়েছে জেনারেটার। এই বৈদ্যুতিক যন্ত্রটি দরকার ক্যামেরা ও টেপরেকর্ডার চালানোর জন্য। ক্যামেরা ও টেপরেকর্ডার চলে সমান গতিবেগে।

আউটডোর শুটিং তোমাদের কাছে মনে হতে পারে পিকনিকের মতো, কিন্তু জুনিয়ার টেকনিশিয়ানদের কাছে পিকনিক নয়, কারণ ওদেরকে—ভারী ভারী রিফ্লেকটার্সগুলি সামলাতে হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছেও এ পিকনিক নয়। রিফ্লেকটার্সের মধ্য দিয়ে সূর্যের তীব্র আলো চোখে নিয়ে তাদের অভিনয় করে যেতে হয়। পিকনিকের মজা এতে কিন্তু নেই। তবে কিনা, বছরের পর বছর ধরে রিফ্লেকটার্সের আলো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছে অনেকটা চোখ সওয়া হয়ে যায়। পরে আর অতটা চোখের জল পড়ে না। পরে তোমরা দেখবে প্রখর সূর্যালোকেও তোমার প্রিয় অভিনেতার হাস্যোজ্জ্বল মুখ, তখন মনে পড়বে, রিফ্লেকটার্সের আলো কেমন করে তীরের মতো এসে বিঁধছিল ঐ অভিনেতার দুচোখে। আর সেটা কী পরিমাণ যন্ত্রণাদায়ক ছিলো তার কাছে।

সকলেই জানেন, বলেও থাকেন, আউটডোর শুটিং-এর ক্ষেত্রে সকাল বেলাটাই সবচেয়ে ভালো সময়। বেলা বাড়লে গরম বেড়ে যায়, সূর্যালোকেরও তেজ বেড়ে গিয়ে এমন হয়—যাকে বলা যায়, 'টপ লাইট'। তখন কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চোখের কোণে ছায়া পড়বেই। আর তা দূর করতে ব্যবহার করতেই হবে রিফ্লেকটার্স। ঐ অবস্থায় রিফ্লেকটার্স বাস্তবিকই শিল্পীদের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। কিন্তু খুব কম ইউনিটের পক্ষেই বেলা দশটা কি এগারটার আগে শুটিং শুরু করা সম্ভব হয়। নায়কের ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে যায়, কেননা গতকাল গভীর রাত্রি পর্যন্ত পার্টি ছিলো। নায়িকা তৈরী হতে, মেকআপ করতে কম করেও দুটি ঘণ্টা সময় নেবেনই। সংলাপ ঠিক করে নিতে রিহার্সালের জন্যও সময় চাই। সব যখন গুছিয়ে নেওয়া হলো, সাজিয়ে নেওয়া হল (ক্যামেরাকে সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করতে একটা বিরাট ছাতার ছাউনি চাই) ততক্ষণে সমুদ্রতীরের বালি তেতে আগুন।

আউটডোর শুটিং কেবল রোমান্টিক নাচ গানের দৃশ্য তোলার জন্যই



শুটিং শুরুর আগে অভিনেতারা বিশ্রাম করছেন

নয়, অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ও নাটকীয় ঘটনাবলীর দৃশ্যও সেখানে তোলা হয়। সমুদ্রতীরে বা নৌকোয় বা গভীর সমুদ্রে স্টিমারে তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ মারপিটের দৃশ্যও তোলা হতে পারে। কিংবা একটি পিকনিকের দৃশ্যও হতে পারে। দৃশ্য যাই হোক, এটা তো জানলে, শুটিং ব্যাপারটা মোটেই পিকনিক নয়।

যাই হোক, স্টুডিওর চার দেয়ালের বাইরে চলে এলে, তোমরা সামাজিক বন্ধনমুক্তির স্বাদ পাবে। সুঠাম দেহ নায়ক, সুন্দরী নায়িকা, প্রখ্যাত পরিচালক, নামী ক্যামেরাম্যান—এঁরা সকলেই তখন খোলা মনে ভ্রাতৃত্বসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দলের সবার সঙ্গে—টেকনিসিয়ান, ভাড়া করা সাউণ্ড ট্রাকের কর্মীবৃন্দ, সহকারী পরিচালক, মেকআপম্যান, ড্রেসার প্রত্যেকের সঙ্গে মিশতে পারেন।

সাউণ্ড ট্রাকের কর্মীদের জিজ্ঞেস করলে তারা বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্কে কত মজাদার গল্পই না শোনাবেন তোমাদের। সে সব গল্পের কোনটায় তাঁদের সহৃদয় মনের পরিচয় মেলে। কোনটায় মেলে অহঙ্কার স্বার্থান্ধতা, ঈর্ষাপরায়ণতা আর দম্ভের পরিচয়। এই সাউণ্ড ট্রাক ভাড়া নিতে হয়। ফলে এর সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা বিভিন্ন ইউনিটের সঙ্গে ধারে কাছের আউটডোর শুটিং করতে যেমন যান, তেমনি যান দূরে কাশ্মীর অথবা আসাম, মেঘালয় অথবা উটিতে। এক মাস হয়তো রাজস্থানের মরুভূমিতে গরমে সেদ্ধ হওয়ার উপক্রম, পরের মাসেই হয়তো কুফরি অথবা গুলমার্গের তুষার হাওয়ায় জমে যাচ্ছেন। ওরা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান আর খুব কাছ থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নানা 'মুড' এর সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে থাকেন। ওঁদের কেউ যদি এসব নিয়ে একটি বই লেখেন, তাহলে সেই বই না জানি কত চিত্তাকর্ষকই হবে।



# ভুতুড়ে গলার গান

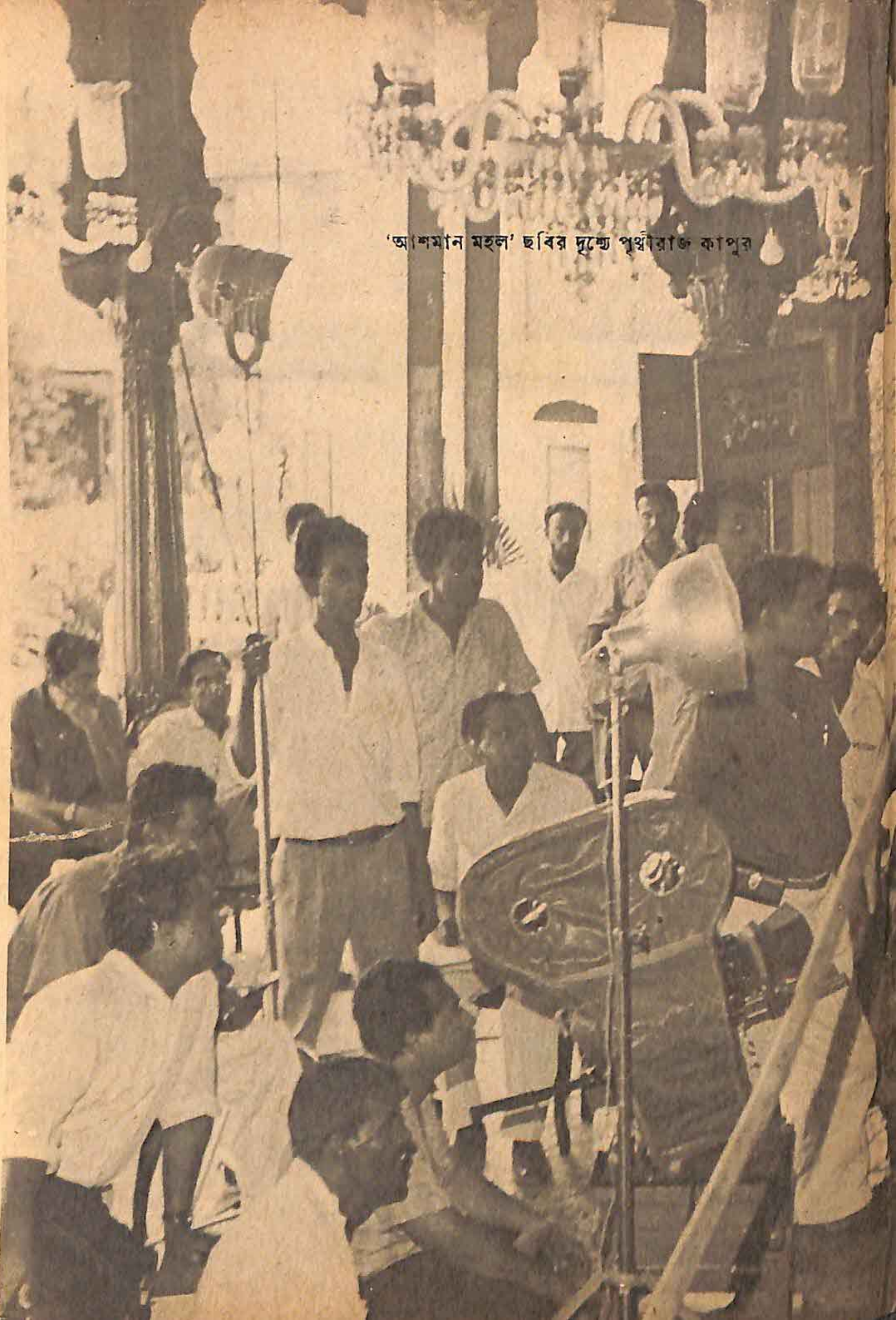
ছায়াছবিতে যেদিন থেকে কথা বলা শুরু হলো, প্রায় সেই সময় থেকেই গানেরও চল হলো।

গোড়ার দিকে ভারতে সিনেমার বিজ্ঞাপনে তো লেখাই হতো : সবাই কথা বলে, সবাই গান গায়। দারুণ ব্যাপার!

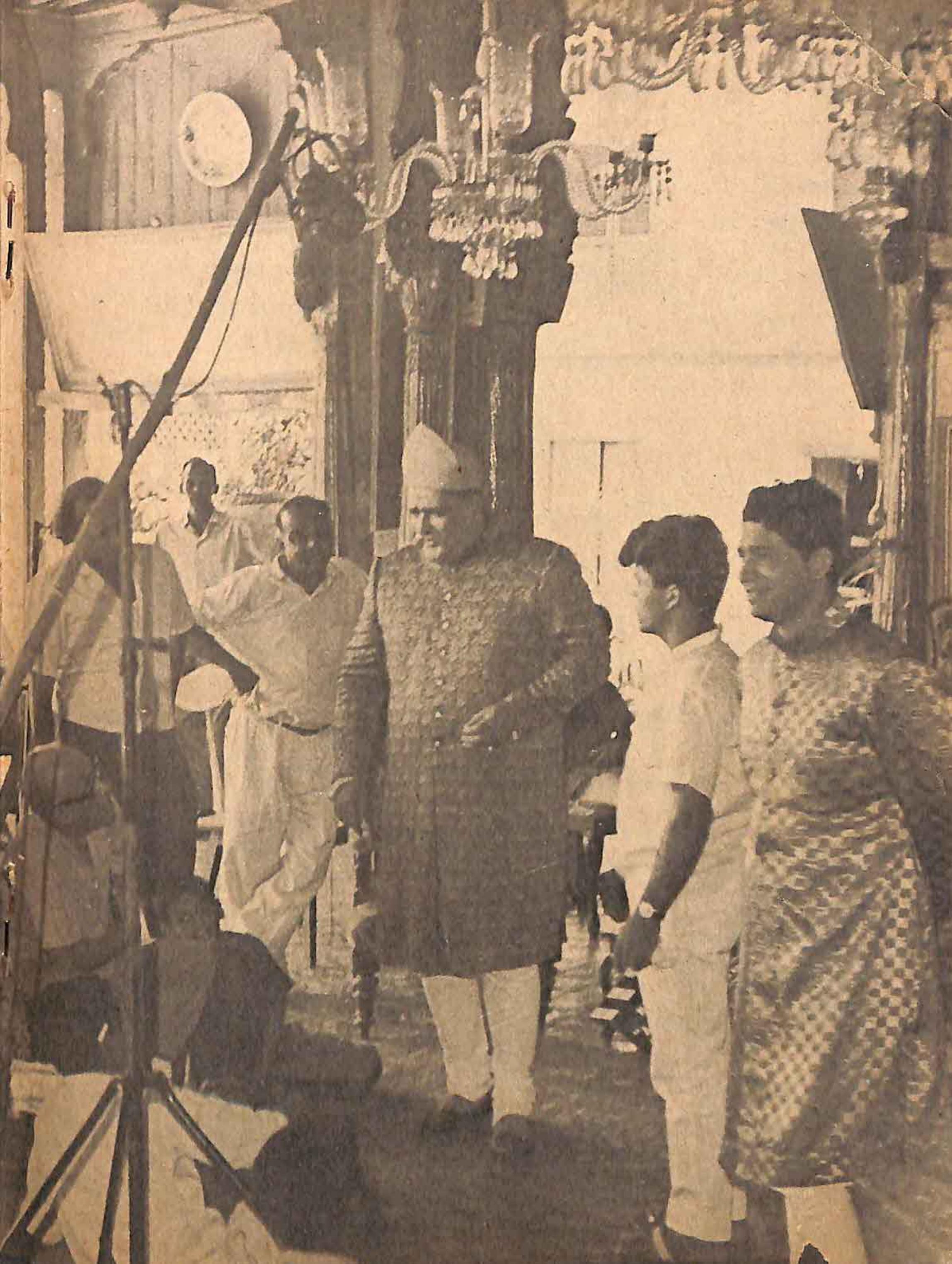
সিনেমায় সঙ্গীতবহুল গল্পের দারুণ চাহিদা। নায়ক বা নায়িকার গানেরও চাহিদা প্রচুর। সিনেমার একজন অভিনেতার গুণাবলীর পক্ষে গান গাইতে পারাটা ছিল অভিনয়ক্ষমতা বা শারীরিক সৌন্দর্যের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

পরে প্লে-ব্যাক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো। এবং এই ঘটনা সিনেমা জগতে এক বিপ্লব ঘটালো। কিন্তু এই ঘটনার তাৎপর্য বোঝার আগে বুঝতে হবে ছায়াছবিতে সাউণ্ড রেকর্ডিং-এর মূল বিষয়টা কী।

সবাক ছায়াছবির সূত্রপাত হলো ছবি ও শব্দ—ফটোগ্রাফি ও সাউণ্ড রেকর্ডিং-এর 'যুগলমিলনে'। গোড়ার দিকে নির্বাক ছবি পর্দায় দেখানোর সময় জায়গায় জায়গায় শিল্পীদের দিয়ে নেপথ্য থেকে কিছু যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কোন দৃশ্য বুঝিয়ে দিতে বা পড়তে



'আশমান মহল' ছবির দৃশ্যে পৃথ্বীরাজ কাপুর



পারে না এমন দর্শকদের জন্য ছবির পরিচয়পত্র পাঠ অর্থাৎ ধারাবিবরণীর ব্যবস্থা ছিল। কখনও নায়ক-নায়িকার সংলাপও একজন বলে যেতেন। এর পরের ঘটনা—গ্রামোফোনে ছবির কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাজনা বাজানো। সংলাপও ধরে রাখা হতো রেকর্ডে। সেই রেকর্ড গ্রামোফোনে মোটামুটি ভাবে ছবির গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখে বাজান হতো। ফলে, এমন একটা ধারণা হতো যেন, ছবির অভিনেতা অভিনেত্রীরা কেবল ঠোঁটই নাড়ছে না, সত্যি সত্যি কথাও বলছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবাক ছায়াছবি বা 'টকি' শুরু হলো তখনই, যখন শব্দও ফিল্মের মধ্যে ছবির মতো মুদ্রিত করা সম্ভব হলো। ছবির প্রিন্ট তৈরির সময় একই সঙ্গে ফিল্মের বাঁ পাশে কিনার ঘেঁষে শব্দাবলী বা সাউণ্ড ট্রাকও প্রিন্ট করা হয়।

পদ্ধতিটা মূলগতভাবে এইরকম ঃ সেটে উপর থেকে একটা মাইক্রোফোন ঝুলছে। এর অবস্থান এমন যে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর গলার সুর ভালোভাবে রেকর্ড করা সম্ভব হয়। অথচ মাইক্রোফোনটি ক্যামেরার দৃষ্টির মধ্যে পড়ছে না। মাইক্রোফোনের সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যুতিক তারের অপর অংশ রয়েছে সাউণ্ড রেকর্ডিষ্ট-এর বুথে। সংলাপ বলতে শুরু করলেই রেকর্ডার চলতে শুরু করে। রেকর্ডারে যে ফিল্ম চলছে তা ছবি তোলার জন্য ব্যবহৃত ফিল্মের সঙ্গে গোড়া থেকেই এক সূত্রে বাঁধা। ছবি তোলার জন্য ফিল্ম যে গতিতে চলে সাউণ্ড রেকর্ডারেও ফিল্ম চলে সেই একই গতিবেগে। ফিল্মে শব্দ রেকর্ড করার সময় ফিল্মের ধার ঘেঁষে আঁকাবাঁকা দাগ পড়তে থাকে। এরপর সাউণ্ড ফিল্মের নেগেটিভ ও ছবির ফিল্মের নেগেটিভ একসঙ্গে প্রিন্ট করা হয়। একেই বলে 'ম্যারেড প্রিন্ট'। তখন ফিল্ম দাঁড়ায় একটি, যাতে ছবি আছে শব্দও আছে। বস্তুতঃ, এই 'ম্যারেড প্রিন্ট'-ই সিনেমা হলে প্রজেকটারের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে থাকে রূপোলি পর্দায়। আর ওই ম্যারেড ফিল্মের শব্দের অংশ বা সাউণ্ড ট্রাকের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় বৈদ্যুতিক শক্তি, তা ফটো ইলেকট্রিক সেলকে করে তোলে সক্রিয়। তখন ওই সেল থেকে শব্দ তরঙ্গ গিয়ে

উপস্থিত হয় এমপ্লিফায়ার-এ। সেখান থেকে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যেই শব্দতরঙ্গ পৌঁছয় লাউড স্পীকার-এ। লাউড স্পীকার থাকে রূপোলি পর্দার পেছনে। তখনই দর্শকরা ছবির সঙ্গে শুনতে পায় শব্দ ও সংলাপ, গান ইত্যাদি। শব্দগ্রাহক ফিল্ম ও ছবির ফিল্ম যদি সঠিকভাবে একসূত্রে গাঁথা হয়ে থাকে তাহলে ছবির চরিত্রগুলির কথাবার্তা, ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে সংলাপও একই সঙ্গে একই ভঙ্গীতে উচ্চারিত হবে এবং তখন মনে হবে ছবির চরিত্রগুলিই বুঝি সরাসরি কথা বলছে, বা হাসছে বা গান গাইছে।

কী ছবি তোলা, কী শব্দ যন্ত্রস্থ করা—দুক্ষেত্রেই নানা পরিবর্তন ঘটেছে। সাদা কালো ছবির বদলে এখন তোলা হচ্ছে ব্যাপকভাবে রঙীন ছবি। শব্দগ্রহণ যাতে নিখুঁত ও স্পষ্ট হয় তার জন্য পুরোনো সাউণ্ড মেশিনের বদলে ব্যবহৃত হচ্ছে টেপরেকর্ডার। এসব যতই হোক, মূল পদ্ধতিটা কিন্তু একই রয়ে গিয়েছে।

ছবির জন্য এবং শব্দের জন্য নেগেটিভ ফিল্ম দুটি আলাদা আলাদা। তাহলে কেমন করে এই দুটিকে সঠিকভাবে মিলিয়ে একটি প্রিণ্ট-এ পরিণত করা হয়? এটা করার একটা সরল পদ্ধতি রয়েছে। তাহলো একটি কালো প্লেট বা বোর্ড তাতে লেখা থাকে দৃশ্যের, শট ও টেক-এর নম্বর। প্রত্যেক শট শুরু হওয়ার আগে নম্বর লেখা ওই প্লেটটিকে প্রথমে ক্যামেরার সামনে তুলে ধরা হয়। তখন পরিচালক নির্দেশ দেন: "সাউণ্ড স্টার্ট"। সাউণ্ডম্যান তখন রেকর্ডার চালু করে দেন। পরবর্তী নির্দেশে বলেন, "ক্যামেরা"। ক্যামেরাম্যান চালু করেন তাঁর ক্যামেরা। তখন ক্ল্যাপ বয় —একজন সহকারী—ওই প্লেট বা বোর্ডে লেখা দৃশ্য, শট ও টেক-এর নম্বর-গুলি বলে যায়। তারপরই বোর্ডের সঙ্গে লাগানো কাঠ দিয়ে হাততালির শব্দ তুলে প্লেট বা বোর্ড সরিয়ে নেয়। এই যে হাততালির শব্দ রেকর্ডারে ধরা রইলো, এইটি হলো একটি সুনির্দিষ্ট চিহ্ন যেখান থেকে একটি শট-এর ছবি ও শব্দ সঠিকভাবে ফিল্মের ফ্রেমে একসূত্রে গাঁথা হয়ে রইলো।

প্রথম দিকে গান গাওয়া হতো ক্যামেরার সামনে—যেমন করে সংলাপ বলা হয়ে থাকে। এবং অভিনেতা বা অভিনেত্রীরাই গান গাইতেন।

কিন্তু ভালো গাইয়ে মাত্রই ভালো অভিনেতা সব সময় হতেন না। আবার ভালো অভিনেতা হলেই গাইয়ে হবেন এমন কোন কথাও নেই। তাছাড়া সব গাইয়ের গলার স্বর সব সময় রেকর্ড করার উপযুক্ত নয়। আবার গান ও ছবি একই সঙ্গে রেকর্ড হলেও সমানভাবে গানের সঙ্গে যেসব যন্ত্র বাজানো হয়, তার শব্দ যন্ত্রস্থ করা সম্ভব হয় না। কারণ, ঐ যন্ত্রগুলি রাখতে হয় ক্যামেরার দৃষ্টির আওতার বাইরে অথচ যন্ত্রগুলি থাকা দরকার গাইয়ের ও মাইক্রোফোনের কাছাকাছি। এই সব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে প্লে-ব্যাক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর।

প্লে-ব্যাক পদ্ধতির মোদ্দা কথাটা হলো, প্রথমে আলাদাভাবে গান বাজনাসহ সঠিকভাবে রেকর্ড করে নেওয়া হবে। তারপর স্টুডিওর মধ্যে শেট-এ বা আউটডোর শুটিং-এ সেই গান দৃশ্যের অভিনয় চলাকালে প্রয়োজন মতো বাজানো হবে। অভিনেতা বা অভিনেত্রী গানটা সম্পর্কে আগে থেকেই রিহার্সাল দিয়ে নেবেন। ফলে, অভিনয়ের সময় গান চলতে চলতে অভিনেতা বা অভিনেত্রীও যথার্থভাবে ঠোঁট চালাতে সক্ষম হবেন —অর্থাৎ ওঁরাও গানটা গাইবেন। কিন্তু সে গান রেকর্ড হচ্ছে না। রেকর্ড করা গানের সঙ্গে মিলিয়ে এবার ছবিটা উঠছে। সুতরাং প্লে-ব্যাক পদ্ধতিতে অভিনেতা-অভিনেত্রীর গলায় যে গান, তাকে বলা যেতে পারে ভূতুরে



গলার গান। শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত, সুদর্শন, যোগ্য ব্যক্তিরা ক্রমেই সিনেমায় আসছেন অভিনয় করতে। গান গাইতে পারতেন না বলে আগে এঁদের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাছে ছায়াছবির দরজা বন্ধ ছিল। ভারতে প্লে-ব্যাক পদ্ধতির ফলে গাইয়ে অভিনেতাদের বা অভিনেত্রীদের দিন শেষ হয়ে গেল। বস্তুতঃ, একই সঙ্গে গান ও অভিনয়ে সমান পারদর্শিতা দুর্লভ। নতুন করে প্রতিভাবান কিছু অভিনেতা অভিনেত্রীর আবির্ভাব ঘটলো। এতেও কিন্তু নতুন করে কিছু সমস্যা দেখা দিল।

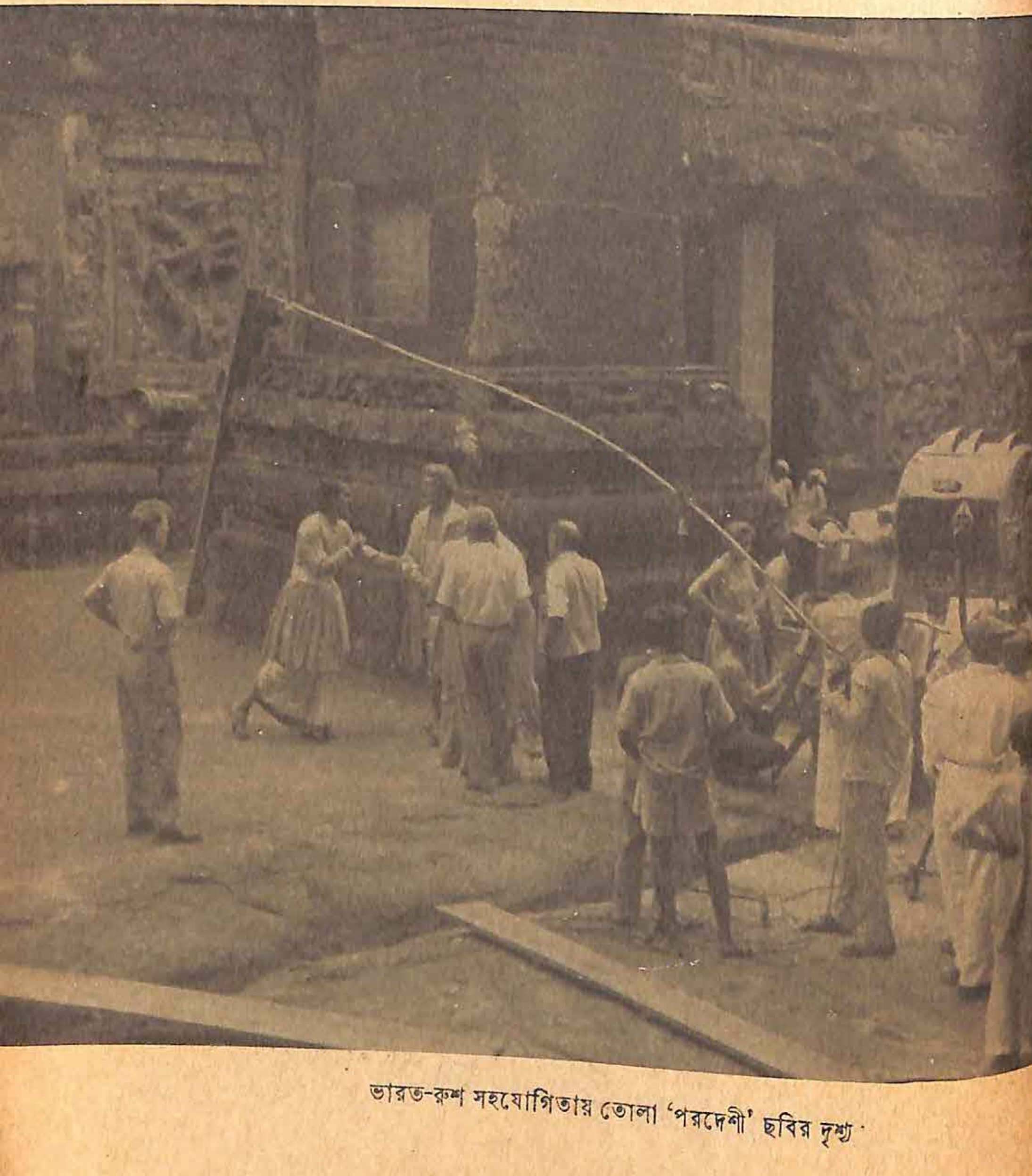
সিনেমার দর্শকদের মনোরঞ্জনে পটু জনপ্রিয় প্লে-ব্যাক গায়ক-গায়িকার সংখ্যা খুব বেশি নয়। প্রযোজকরা সকলেই চান সেই মুষ্টিমেয় গায়ক-গায়িকাদের। ফলে এক একটা সময় আসে, যখন দেখা যায়, সব নায়িকারাই গান গাইছেন হয় লতা মুঙ্গেশকর, না হয় আশা ভোঁসলের গলায়। কিম্বা নায়কদের গলায় গান কেবল মহম্মদ রফি বা কিশোর কুমারের। ব্যাপারটা কখনও কখনও অস্বাভাবিকও। দিলিপকুমার ও রাজকাপুর—দুজনের ক্ষেত্রেই একই গলার গান চলতে পারে কি করে? যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রশ্ন জড়িত, অর্থাৎ যেখানে সবসময়ই প্রতিযোগিতা সেখানে প্রযোজকরা যদি নামী ও জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী বা গায়ক-গায়িকাদের পিছনে ছোটেন তবে নিশ্চয়ই তোমরা তাদের দোষ দিতে পার না।

শব্দ যন্ত্রস্থ করা বা সাউণ্ড ফিল্ম তৈরি করার ব্যাপারে আরও এক ধরনের ঘটনা ঘটে, যাকে এককথায় বলা যেতে পারে প্লে-ব্যাক পদ্ধতির ঠিক বিপরীত।

সাউণ্ড প্রুফ স্টুডিওর বাইরে খোলা জায়গায় শুটিং করার রেওয়াজ ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আর সেইজন্যেই সাউণ্ড রেকর্ডিষ্ট বা শব্দযন্ত্রীকে এক নতুন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। বাইরে শুটিং করার প্রধান অসুবিধা সেখানে নিখুঁতভাবে সংলাপ ইত্যাদি রেকর্ড করা সম্ভব হয় না। অভিনেতা সংলাপ বলছেন, সেই সময়েই চারপাশে শুটিং দেখতে আসা কৌতূহলী দর্শকদের ফিসফিসানি চলেছে, ঝম ঝম শব্দ করে



নিজের ক্যামেরা ইউনিটের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়



ভারত-রুশ সহযোগিতায় তোলা 'পরদেশী' ছবির দৃশ্য



অদূরে একটা ট্রেন চলে গেল, মোটরগাড়ির শব্দ হচ্ছে, শুটিং-এর আলোর জন্য ইলেকট্রিক জেনারেটার চলার শব্দও ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে যন্ত্রপাতি নিয়ে যাওয়ার শব্দ হয়, ক্যামেরার নড়াচাড়ার শব্দও হতে পারে—এই ধরনের নানারকমের বিপত্তি ঘটে থাকে। ফলে সংলাপ স্পষ্ট শোনা যায় না, অনেক সময় অন্যান্য শব্দের কাছে তা চাপা পড়েও যায়।

এই সব অবাঞ্ছিত অতিরিক্ত বিরক্তিকর শব্দ মূল সাউণ্ড ট্র্যাক থেকে মুছে ফেলা যায় না। কিন্তু 'ডাবিং' পদ্ধতির সাহায্যে আবার একটি নতুন সাউণ্ড ট্র্যাক তৈরী করা সম্ভব, যেখানে অভিনেতার গলাই কেবল শোনা যাবে। একে বলা হয় শব্দ-পুনর্যোজন পদ্ধতি।

বাইরে থেকে শুটিং করে আসার পর স্টুডিওতে আবার একবার সংলাপ গ্রহণ করা হয়। বাইরে যে সংলাপ গ্রহণ করা হয়েছিল, স্টুডিওতে তা চালানো হয়। অভিনেতা তা শোনেন, আগের বলা সংলাপের সঙ্গে মিলিয়ে এবার আর একবার নতুন করে সংলাপ উচ্চারণ করেন। এই নতুন করে বলা সংলাপ যথার্থভাবে আগের সাউণ্ড ট্র্যাকে যন্ত্রস্থ সংলাপের জায়গায় বসানো হলো। এবার আর অতিরিক্ত শব্দ রইলো না।

গোটা ছবিটা এমনকি একটা পুরো রীল একসঙ্গে 'ডাবিং' করা হয় না। একটি ঘটনাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে টুকরো টুকরো ভাবে ডাবিং করা হয়ে থাকে। এটার উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয়বার সংলাপ উচ্চারণ করার সময় প্রথমবারে বলা সংলাপের ভঙ্গী ও স্বর প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রিহার্সালের সুযোগ বেশি পান।

ডাবিং করার সময় পর্দার পিছনের লাউড-স্পীকার থেকে শব্দ সরিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীর কানের ইয়ার ফোনে আনা হয়। এর সাহায্যে ওঁরা আগে বলা নিজেরই সংলাপ শুনতে পান। হাতে থাকে একটি মাইক্রোফোন। ওই মাইক্রোফোনের সামনে তিনি নতুন করে সেই সংলাপ বলেন। সামনে একটা পর্দায় ছবিটা চলতে থাকে—যার সাহায্যে অভিনেতা বা অভিনেত্রী তাঁর প্রতিটি ভাবভঙ্গী ও ঠোঁট নাড়া লক্ষ্য করতে পারছেন। হঠাৎ যদি দেখা যায় আগে সংলাপ বলার সময় যেভাবে ঠোঁট নড়েছে দ্বিতীয়বার বলার সময় তা দেখে নেওয়া দরকার, কয়েকবার রিহার্সাল দেওয়ার দরকার তাহলে সাউণ্ড ট্র্যাক বন্ধ করে দিয়ে রিহার্সাল দিয়ে আবার তা চালু করা যেতে পারে।

এই ভাবে, একই পদ্ধতিতে, অভিনেতার বিশ্রি গলায় উচ্চারিত সংলাপ পরিবর্তিত হতে পারে সুকণ্ঠ কোন ডাবিং আর্টিষ্টের দ্বারা। মীনাকুমারী একটি ছবিতে কাজ করতে করতে মারা যান। ছবিটায় মীনাকুমারীর সংলাপ ডাবিং করা হয়েছিল অন্য একজন শিল্পীর দ্বারা—যাঁর কণ্ঠস্বর, ঠোঁট নাড়ানোর ভঙ্গী, উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে মীনাকুমারীর মতো।

একই পদ্ধতিতে কোন সিনেমার ভাষা অন্য ভাষায় 'ডাবিং' করা যেতে পারে। অবশ্যই এক্ষেত্রে মূল ভাষায় সংলাপ উচ্চারণের সময় ঠোঁট নাড়ানোর ভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য রেখে অন্য ভাষায় সংলাপ রচনা করতে হবে। ধরা যাক 'আওয়ারা' ছবিটির কথা। এই ছবিটি এমন নিখুঁতভাবে রুশ ভাষায় ডাবিং করা হয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল রাজকাপুর, নার্গিস ও পরলোকগত পৃথ্বীরাজ যেন ছবিতে রুশ ভাষাতেই কথা বলছেন। রুশ ভাষার সংলাপ এমনভাবে লেখা হয়েছে, রুশ 'ডাবিং' শিল্পীরা এমন দক্ষতার সঙ্গে সংলাপ উচ্চারণ করেছেন যে, মূল শিল্পীদের ঠোঁট নাড়ানোর ভঙ্গীর সঙ্গে তা চমৎকার মিলে গিয়েছিল।

সিনেমার যাদু কেবল চোখে দেখারই নয়, কানে শোনারও। ভূতুড়ে গলার গান শুনি আমরা গাইয়ে নন এমন জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর ঠোঁট নাড়ানোর মাধ্যমে। তেমনি শোনা যায়, ভারতীয় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কথা বলছেন রুশ ভাষায়, তামিলভাষী অভিনেতার মুখে শোনা যায় হিন্দী সংলাপ।



# সিনেমার টেমপো

তোমরা হয়তো তোমাদের স্কুল ম্যাগাজিন অথবা স্থানীয় কোন পত্রিকা সম্পাদনা করে থাকবে। তাতে তোমরা প্রবন্ধ, কবিতা, হাস্যরচনা, কোন উপাখ্যান বা ছবি ইত্যাদি জমা দিলে সম্পাদকের কাছে। সেগুলি সম্পাদনা করে ছাপা হলো। এক্ষেত্রে তোমরা জানো, সম্পাদনা বলতে কী বোঝায়।

সিনেমার ছবির সম্পাদনাও নীতিগতভাবে ওই একই রকমের, তবে এক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আরও বেশি।

যখন একটি স্কুল ম্যাগাজিন অথবা একটি সংবাদপত্র সম্পাদনা করার কথা ওঠে, তখন সম্পাদকের কাজ হচ্ছে সংবাদ, নিবন্ধ, কবিতা, অন্যান্য সাহিত্য বিষয়ক রচনা, কার্টুন, ছবি ইত্যাদি কোন কোনটা যাবে তা চূড়ান্তভাবে স্থির করা, লেখাগুলো ঠিকঠাক করা এবং সব মিলিয়ে ব্যাপারটা কী রকম হবে তা স্থির করা। যদি বিজ্ঞাপন থাকে, তাহলে তারও কথা ভাবতে হয়। এখন, এই যে একটি সংবাদ, একটি কবিতা বা একটি বিজ্ঞাপন— এগুলির প্রত্যেকটিরই নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে। এগুলির ভালো মন্দ স্বতন্ত্রভাবে বিচার করে দেখতে হয়।



ফিল্ম এডিটিং ( সম্পাদনা )

ছায়াছবিতে আলাদাভাবে কোন শট, কোন ছবি বা সাউণ্ড ট্র্যাকের কোন অর্থই হয় না। অর্থ হয় তখনই যখন সম্পাদক এগুলিকে জুড়ে দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। ছায়াছবির গল্পকার যা বলতে চেয়েছেন, পরিচালক যেভাবে ছবিটি তুলতে চেয়েছেন, সেসব কথা মনে রেখে সম্পাদককে তাঁর কাজ করতে হয়। সম্পাদকই শট-এর পর শট, দৃশ্যের পর দৃশ্য জোড়া দেন। তিনিই বোবা ছবিগুলোতে সংলাপ সংযুক্ত করেন যথার্থভাবে। আর তখনই ছবি, শব্দ ইত্যাদি পারম্পর্য রক্ষা করে মিলেমিশে একটি অর্থবহ ছায়াচিত্রে পরিণত হয়। তা না হলে, যেভাবে ছবি তোলা হয়, সংলাপ গৃহীত হয়—সেগুলির এমনিতে কোন মানেই হয় না। সেগুলি একগাদা ছবি মাত্র।

নাচ গানের একটি দৃশ্য তোলার পর সম্পাদক বা তাঁর সহকারী নাচের আসরে বা গানের আসরে অভিনেতা-অভিনেত্রীর ঠোঁট নাড়ানোর ভঙ্গী, চলাফেরার ভঙ্গী, অন্যান্য আচরণের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি লক্ষ্য করে শব্দ ও দৃশ্যের মধ্যে ছবি ও সাউণ্ড ট্রাকের সাহায্যে সমতা আনেন। এর ফলেই ছবিতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঠিকভাবে নাচতে গাইতে কথা বলতে দেখা যায়।

ছবির ভালোমন্দ বিচার করেন পরিচালক। কিন্তু একথা সত্যি, সম্পাদকের বুদ্ধিদীপ্ত ও সহৃদয় সহযোগিতা ছাড়া কোন পরিচালকের পক্ষেই ছবি করা সম্ভব নয়।

সিনেমা দেখতে গিয়ে তোমরা মাঝে মাঝে অনুভব করতে পারো, ছবির 'টেমপো'—যাকে বলা যেতে পারে ছবির মজা তা অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে। আবার কখনও তা অত্যন্ত ঢিমে তালে, মজাটা জমছে না। কেন এরকম হয়, তা তোমরা এখনই বলতে পারবে না। আসলে এটা নির্ভর করে সম্পাদকের দক্ষতার উপর। যখন দেখা যায়, একটা ছবিতে আগাগোড়া একটা সুসমঞ্জস্য 'টেমপো' বজায় আছে, তখন বুঝতে হবে ছবিটি যিনি সম্পাদনা করেছেন, তাঁর রয়েছে দক্ষতা, রয়েছে বিস্তর অভিজ্ঞতা—তিনি ভালোভাবেই জানেন, কোন দৃশ্য বা কোন শট কতটা দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। কাঁচি চালিয়ে তিনি অপ্রয়োজনীয় ও বিরক্তিকর অংশ বাদ দিয়ে একটা ছবিকে বাঁচিয়ে দেন। ঠিক একজন সার্জেনের মতোই—যিনি অস্ত্রোপচার করে মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান।

একটি ছবির পরিচালককে বলা হয়, জাহাজের ক্যাপটেন। কথাটা সত্যি। কেননা, গোটা ছবিটা তাঁরই নির্দেশে, তাঁরই পরিচালনায় তৈরি হয়ে থাকে। জাহাজের ক্যাপটেনের মতোই তাঁরও জানা আছে, কোন দিকে কী ভাবে তাঁকে যেতে হবে। যদি পরিচালক হন জাহাজের ক্যাপটেন, তাহলে সম্পাদক সেই জাহাজের চীফ ইঞ্জিনিয়ার। জাহাজ কতটা গতিবেগ নিয়ে চলবে, তা তাঁর জানা আছে। পরিচালক যে দিক নির্দেশ করে নিয়েছেন, সম্পাদককে সেই দিকচিহ্ন লক্ষ্য করেই এগোতে হবে। পরিচালক আবার এই দিক নির্দিষ্ট করেছেন লেখকের সঙ্গে পরামর্শ করে। সেইজন্যই দেখা

যায়, ভারতে এবং বিদেশে অনেক বিখ্যাত পরিচালক নিজেই সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন অথবা সম্পাদনার কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন।

সিনেমা তৈরির নতুন নতুন পদ্ধতি যতই জনপ্রিয় হচ্ছে, সম্পাদকের কাজেও তত জটিলতা বাড়ছে। 10নং শট-এর পর 11নং শট জুড়ে দিয়ে বা 44নং দৃশ্যের পরে 45নং দৃশ্য জুড়ে দিয়ে চিত্রনাট্যের চাহিদা পূরণ করার কাজই সম্পাদকের পক্ষে এখন আর একমাত্র কাজ নয়। অর্থাৎ এখন চিত্রনাট্যে যা লেখা আছে তা মেনে চলাই তার কাজ নয়। কলাকৌশলের দিক থেকে পরিচালক ও সম্পাদকের কাজে এখন অনেক বৈচিত্র্য ও উন্নত মানের শৈলী আশা করা হয়ে থাকে।

লেখক এবং পরিচালক কেউই ছবিতে সরাসরি ও সাদাসিধে ভাবে গল্প বলে যাওয়ার ব্যাপারে আর তেমন উৎসাহ বোধ করেন না। যা ঘটেছে, ওঁরা কেবল সেটুকুই বলতে চান না, তার সঙ্গে এও বলতে চান, কী ঘটতে পারতো। ওঁরা ছবিতে চরিত্রগুলির চালচলন ফুটিয়ে তোলা ছাড়াও চরিত্রগুলির চিন্তা ও কল্পনাকেও সুবিন্যস্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এজন্য ফ্লাশ ব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করেন যার সাহায্যে অতীত



দিনের কথা চিত্রায়িত করা যায়, আর ফ্লাশ ফরওয়ার্ড পদ্ধতি—যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন কোন ঘটনার কথা বলা যায়।

সম্পাদক অথবা পরিচালক-সম্পাদককে শুধু তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগাতে হয় এমন নয়, ছবি তৈরি করতে গিয়ে সেই সঙ্গে তিনি মিশেল দেন তাঁর কল্পনাশক্তি এমন কি তাঁর অনুভূতিকেও।

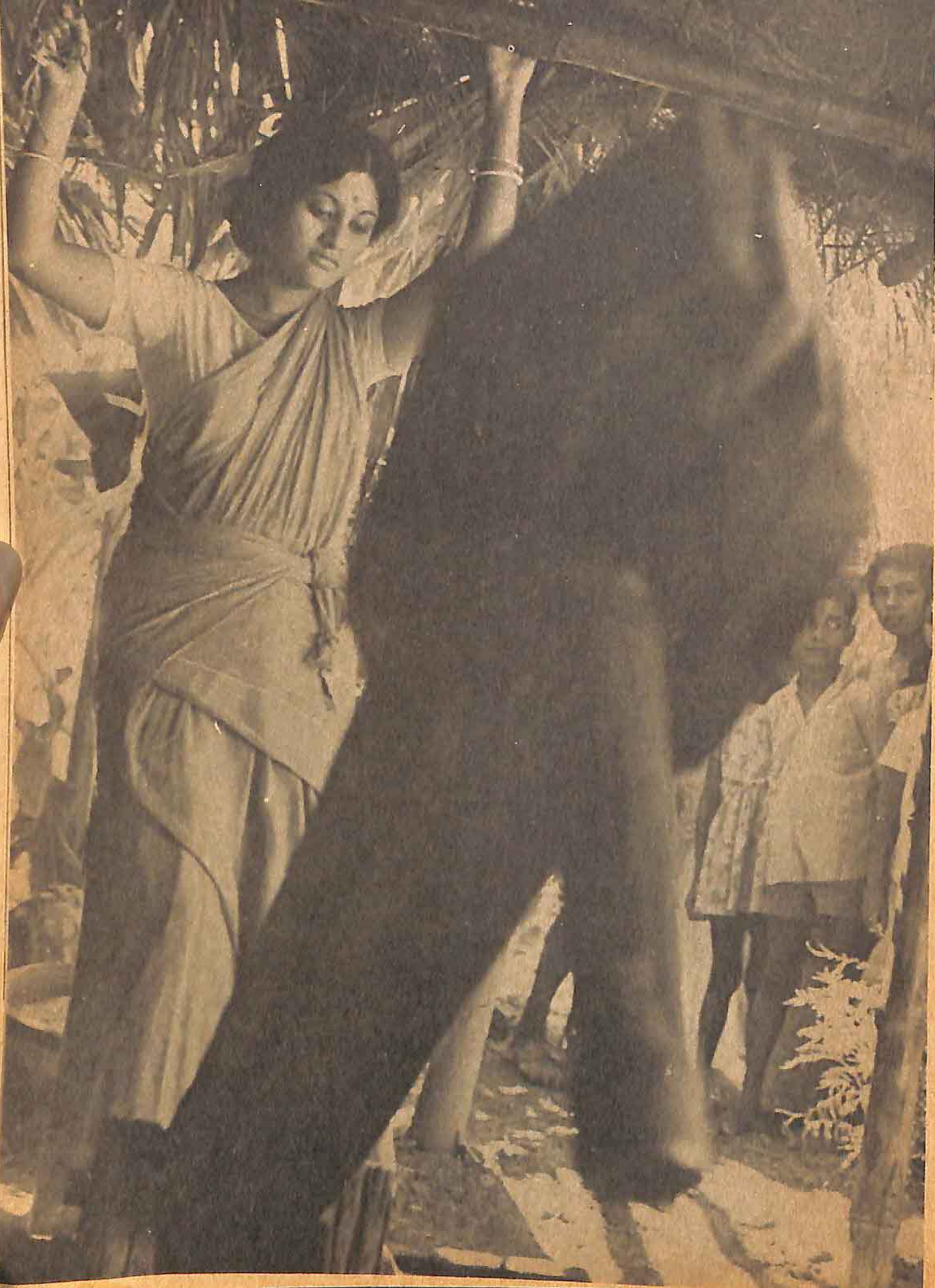
হালফিল ছায়াছবিতে সম্পাদনার কলাকৌশলের ক্ষেত্রে নতুন নতুন বিষয়ের অবতারণা করা হচ্ছে। এইরকম একটি বিষয়—মন্তাজ। এই মন্তাজ প্রথম ব্যবহার করেছিলেন বিখ্যাত রুশ চিত্রপরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইন।

মন্তাজ একটি কৌশল, এর মাধ্যমে কিছু শট বা দৃশ্যকে একসঙ্গে ধরে কোন কাব্যিক, নাটকীয় অথবা সাহিত্য বিষয়ক বক্তব্য বলা হয়। দেখতে গেলে এই শটগুলোর একটার সঙ্গে আর একটার কোন সম্পর্ক নেই। মন্তাজের একটি উদাহরণ রয়েছে চারলি চ্যাপলিনের 'মর্ডান টাইমস্' ছবির প্রথম দুটি শটের মধ্যে। প্রথম শটে দেখানো হচ্ছে এক পাল ভেড়া মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে একটা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। দ্বিতীয় শটে দেখানো হচ্ছে একদল শ্রমিক গেট দিয়ে কারখানায় ঢুকছে। ধীর পায়ে। মাথা মাটির দিকে নোয়ানো। এই দুটি শটের মধ্যে এমনিতে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু দুটি শট এক করে দেখলে যে অর্থ দাঁড়ায় তা হলো : মানুষ ক্রমে ভেড়া বনে যাচ্ছে।

প্রতীক অনেক সময়ই ভারতীয় ছায়াছবিতে মন্তাজের মতোই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, একটি চরিত্রের হঠাৎ মৃত্যুর সময় প্রদীপ নিভে যাওয়ার শট দেখানো হয়। একটি চমৎকার মন্তাজের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে একটি সাদা ঘুড়ি। একজন দরিদ্র কবির মৃত্যুর পরেই দেখানো হলো একটি সাদা ঘুড়ি নীল আকাশে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। কবি ঘুড়ি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ওই ঘুড়ির মধ্য দিয়ে অত্যন্ত কাব্যময় ভাষায় এই কথাই বোঝানো হল, কবির আত্মা স্বর্গের দিকে যাত্রা করেছে। ব্যাপারটা খুবই সরল, কিন্তু ছায়াছবির ক্ষেত্রে এটি একটি চমৎকার রূপকল্প সৃষ্টি করতে পেরেছে।



যাতে মরুভূমিতে শুটিং চলছে



# লক্ষ জনতার গান

যে কেউ বোম্বাই এলে দেখতে চায় ফিল্ম স্টুডিও আর দেখতে চায় গান রেকর্ডিং। আমরা ইতিমধ্যেই ফিল্ম স্টুডিও ঘুরে এসেছি। এবার তোমাদের নিয়ে যাবো রেকর্ডিং থিয়েটারে।

বোম্বাইতে পাঁচটি কি ছয়টি রেকর্ডিং থিয়েটার আছে এবং সেগুলিই সম্ভবত দেশের মধ্যে সবচেয়ে সেরা। এইজন্য মাদ্রাজ বা কলকাতা থেকেও প্রযোজকরা প্রায়ই তাঁদের ছবির গান, বিশেষ করে হিন্দি ছবির গান রেকর্ডিং করতে এইসব রেকর্ডিং থিয়েটারের দ্বারস্থ হন।

তোমরা যদি রেকর্ডিং থিয়েটারে প্রবেশ কর তাহলে এমন হৈ চৈ ব্যস্ততা দেখতে পাবে, যা তোমরা ফিল্ম স্টুডিওতে গিয়েও দেখোনি। দেখতে পাবে প্রায় একশ' যন্ত্রশিল্পী তাঁদের যন্ত্র (কোনটা হয়তো বাঁশির মতো ছোট আকারের, কোনটা আবার পিয়ানো বা অর্গানের মতো বিরাটকায়) নিয়ে হলে উপস্থিত। প্রত্যেকের সামনে আছে একটি করে স্ট্যাণ্ড—যার উপর রাখা আছে পশ্চিমী পদ্ধতিতে সঙ্গীতের লিখিত স্বরলিপি।

নানা দিক থেকে দাঁড় করানো আছে চার পাঁচটি মাইক্রোফোন। এমন

ভাবে দাঁড় করানো যাতে প্রায় সব কয়টি যন্ত্রের সুর সঠিকভাবে রেকর্ড করা যেতে পারে।

যন্ত্রগুলির কয়েকটি সম্পূর্ণ ভারতীয়—সারেঙ্গী, সেতার, তবলা, জলতরঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু বেশির ভাগ যন্ত্রই বিদেশী—বেহালা, বঙ্গো, ড্রাম, গীটার পিয়ানো, অর্গান, কনসারটিনা ইত্যাদি।

এখন তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো, বেশির ভাগ ভারতীয় ছবির গানে—তা হিন্দি অথবা উর্দু বা অন্য যে কোন ভাষাতেই গাওয়া হোক এবং মূল সুর যতই ভারতীয় রাগভিত্তিক হোক—কেন এত পশ্চিমী সঙ্গীতের বাহুল্য—পশ্চিমী ও ভারতীয় সঙ্গীতের এই রাখী বন্ধন মাত্রেই তা খারাপ, এমন নয়। বরং এর ফলে এমন অনেক গানের সৃষ্টি হয়েছে যা অনেকদিন মনে থাকবে। পশ্চিমী পোষাক-আশাক আমাদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে চলছে। পশ্চিমী জীবন-যাপনেও আমরা ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। পশ্চিমী পপ সঙ্গীত আমাদের মধ্যে জনপ্রিয়। আধুনিক কালে বিশেষ করে শিল্পসমৃদ্ধ শহরে আমরা পশ্চিমী ধাঁচের জীবনচর্চায় রপ্ত হচ্ছি। এগুলির সঙ্গে পশ্চিমী সুরের মিশ্রণের ব্যাপারটিও চমৎকার মিলে যায়।

অবশ্যই এর ব্যতিক্রম আছে। কোন কোন সঙ্গীত পরিচালক কেবল মাত্র ভারতীয় যন্ত্রই ব্যবহার করে থাকেন, ভারতীয় রাগাশ্রয়ী গান গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু বেশির ভাগ জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালকরা ভারতীয় ও পশ্চিমী সঙ্গীতের সংমিশ্রণের পক্ষপাতি। অবশ্যই কম-বেশী মাত্রা রেখে। সঙ্গীত পরিচালকরা গান রেকর্ডিং-এর সময় প্রায় সব রকম যন্ত্রেরই ব্যবহার করে থাকেন এটা একটা মর্যাদার ব্যাপার এবং বাণিজ্যের সাফল্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

হল ঘরের পাশেই রয়েছে সাউণ্ড প্রুফ দুটি কেবিন। একটি কেবিন গায়ক-গায়িকাদের জন্যে। এখানে বসে গায়ক-গায়িকারা গান গেয়ে থাকেন, যা নাকি ছায়াছবির মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ শ্রোতার কানে। এখানেই ছবির জন্য গান গেয়ে থাকেন লতা মুঙ্গেশকার, আশা ভোঁসলে, মহম্মদ রফি, কিশোর কুমার, তালাত মাহমুদ ও অন্যান্যরা।



রেকর্ডিং ষ্টুডিওর ভিতরে

এরা কেবিনে গান কখনও একা গান, কখনও তুজনে মিলে কিম্বা সমবেতভাবে।

দ্বিতীয় কেবিনটিতে আছে রেকর্ডিং মেশিন। রেকর্ডিষ্ট ও তাঁর সহকারীরা বসে আছেন। ছুঁয়ে আছেন একাধিক সুইচ নব। সব মাইক্রোফোনের তার রেকর্ডিং মেশিনের সঙ্গে যুক্ত। গান গাওয়া শুরু হলে রেকর্ডিষ্ট ও তাঁর সহকারীরা সুইচ টিপে, নব ঘুরিয়ে আওয়াজ প্রয়োজন মতো কখনও কমান, কখনও বাড়ান। একটা সময় হয়তো গায়ক-গায়িকার গলার স্বর তীব্র হওয়া দরকার। আবার একটি সময়ে হয়তো ড্রাম, তবলা ইত্যাদির আওয়াজ জোর হওয়া চাই। কোন সময় একটি মাত্র যন্ত্রের আওয়াজ—বাঁশি বা সারেঙ্গী বা ক্লারিওনেট অথবা মেক্সাফোন কিংবা বেহালার আওয়াজ শোনানো দরকার। তখন এক একটা নব ঘুরিয়ে এক একটা যন্ত্রের আওয়াজ ধরা হয়।

গানের রিহার্সালের জন্য বেশ কয়েকঘণ্টা সময় দিতে হয়। ঠিকভাবে সুর লাগছে কিনা, বাজনার সঙ্গে গানের মিলমিশ হচ্ছে কিনা, কিভাবে গাইলে মাইক্রোফোনে গলা সুন্দর শোনাচ্ছে—এগুলি ঠিকঠাক করে নিতে বেশ সময় যায়। রেকর্ডিষ্ট ও সঙ্গীত পরিচালক (ইনি রেকর্ডিষ্টের পাশেই বসেন। রেকর্ডিং কেবিনের লাউড স্পীকারে ভেসে আসা গান তিনি মন দিয়ে শোনেন) দুজনে সন্তুষ্ট হলে তবেই প্রকৃতপক্ষে গান রেকর্ডের পর্ব শুরু হয়। প্রথমবারের চেষ্টা বা 'টেক' (এখানকার স্টুডিওতে এইভাবেই বোঝানো হয়ে থাকে) প্রায়ই 'ও. কে' হয় না। একটা গানের রেকর্ডিং-এর জন্য পাঁচ ছয় বার 'টেক' করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে থেকে যেটা সবচেয়ে ভালো শোনায় সেটাই হয় ঠিক বা 'ও. কে টেক' অর্থাৎ ছাড়পত্র পায় সিনেমায় ব্যবহারের জন্য। যে 'টেক' গ্রহণ করা হলো সেটাই পরে সাউণ্ড ফিল্ম-এ বসানো হয়। বাকি 'টেকগুলি' টেপরেকর্ডার থেকে মুছে ফেলা হয়। এভাবে দামি সাউণ্ড ফিল্মের বাজে খরচ বেঁচে যায়।

সাউণ্ড ফিল্মে গান লিপিবদ্ধ হলো। সেই ফিল্ম প্রিণ্ট করা হলো। প্রিণ্টের এক কপি গেল স্টুডিও বা কাশ্মীর, কুলু বা উটকামণ্ডের আউটডোর শুটিংএ প্লেব্যাকে ব্যবহারের জন্য। আর একটি কপি পাঠানো হয় গ্রামোফোন কোম্পানীর কাছে। সেখানে ওই গান রেকর্ড হয়ে দোকানে দোকানে আসে বিক্রির জন্য।

এইভাবে একটি ছবি তৈরির কাজ শেষ হওয়ার আগেই ছবির গানের রেকর্ড রেডিও বা অন্যভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে পৌঁছে যায়। এভাবে ছবিটার প্রচারের কাজও হয়ে যায়।

ভারতীয় ছায়াছবির প্রায় সবগুলিতেই থাকে পপ-সঙ্। কিছু ছবি, যাকে বলা যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক, সেগুলিতে গান থাকে না। এটা অবশ্যই ব্যতিক্রম। সাধারণভাবে ভারতীয় ছবিতে গানের ব্যবহার থাকেই এবং তা করা হয় ছবির ব্যাপক জনপ্রিয়তার উদ্দেশ্যে।

ছবির শুটিং শেষ হয়ে গেল। এতে অনেক নির্বাক দৃশ্য থাকে। সে সব দৃশ্যের একঘেয়েমি কাটাতে ও কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের তাৎপর্য স্পষ্ট

করে তুলতে ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক-এর ব্যবহার করতে হয়। এই মিউজিক রেকর্ডিং-এর কাজটাও হয়ে থাকে রেকর্ডিং থিয়েটারে। ছবির যে যে অংশে ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক ব্যবহার করা হবে, সে সব সুর রচনা করবেন সঙ্গীত পরিচালক। বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলি বাজানো হয়। রিহার্সাল চলে। ওই সময় একটি ছোট পর্দায় ওই দৃশ্যগুলি দেখানো হয়। ছবির দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মিউজিক রচনা ও রিহার্সাল ঠিকঠাক হয়ে গেলে তারপর তা রেকর্ডিং করা হয়। পদ্ধতি সেই একইরকম—যে রকম করা হয়েছে গানের বেলায়। ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক কেবল যন্ত্রের বাজনাই নয়, মাঝে মাঝে এক টুকরো তান বা অন্য কোন ভাবে গলার সুরও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক রেকর্ডিং (গান নেই এমন ছবিগুলির বেলায় এই মিউজিক আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ) হয়ে গেলেই এবার তৈরি হতে হবে রি-রেকর্ডিং এর জন্য। বলতে গেলে, এটাই হলো ছবি তৈরির শেষ পর্যায়।

এবার আমরা খুব শীগ্গীরই ছবিটি দেখতে পাবো পাশের কোন সিনেমা হলে। লক্ষ লক্ষ দর্শক দেখতে যাবে তাদের কাছে-পিঠের সিনেমা হলে। ছবি তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো।

পরিচালক সত্যজিৎ রায়





# কনের সাজ

ইতিমধ্যে ক্যামেরাম্যান তার ক্যামেরায় সব কয়টি দৃশ্যের ছবিই তুলে নিয়েছেন।

সাউণ্ড রেকর্ডিষ্ট সংলাপ, গান রেকর্ডিং করেছেন, ডাবিং করেছেন।

তিনি অন্যান্য শব্দও আলাদাভাবে রেকর্ডিং করেছেন। যেমন, দরজা খোলার শব্দ, রাস্তা দিয়ে চলার সময় বুট জুতার শব্দ, ট্রেনের চাকার ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ, মোটর গাড়ির শব্দ, ঘোড়ার গাড়ি বা গরুরগাড়ির কঁ্যাচ কোচ আওয়াজ, কোন ঠাণ্ডা পানীয় বা মদের বোতলের মুখ খোলার শব্দ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ অথবা বিড়ালের মিঁয়াও।

ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিকও আলাদা

একটা ফিল্মে রেকর্ডিং করা হয়েছে। এই ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক নির্বাক দৃশ্যের সঙ্গে বাজানো হতে পারে, কোন নাটকীয় মুহূর্তকে তাৎপর্যপূর্ণ করতে ব্যবহৃত হতে পারে বা কোন কোন সংলাপের সঙ্গেও ব্যবহার করা হতে পারে। আনন্দ বা দুঃখ, হাসি বা কান্না এমনি নানা পরিবেশে ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক ব্যবহার করা হয়।

তাহলে, তিন পর্যায়ে সাউণ্ড ফিল্মে রেকর্ডিং হয়ে থাকে—সংলাপ, শব্দ ও ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছবির দৃশ্যের ফিল্মের সঙ্গে অর্থাৎ মূল ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত হয় একটি মাত্র সাউণ্ড ফিল্ম।

এর জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে—তার নাম 'মিশ্রণ' বা 'রি-রেকর্ডিং'। অর্থাৎ দুই, তিন বা চারটি সাউণ্ড ট্র্যাক এক জোট হয়ে এক ট্র্যাকের সাউণ্ড ফিল্মে রূপান্তরিত হয়।

প্রথমে প্রত্যেকটি সাউণ্ড ফিল্মের সঙ্গে ছবির ফিল্ম মিলিয়ে যুক্ত করা হয়, যাতে ছবির ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শব্দ সংলাপ বা গান শোনা যায়। তখন বিশেষ ধরনের এক প্রজেকটারের মাধ্যমে ছবি পর্দায় চলতে থাকে। রি-রেকর্ডিষ্ট বসে আছে সামনেই। তাঁর চোখ পর্দায়। কানে শব্দ, সংলাপ আর গানে। হাতের সামনে একটি যন্ত্র। তাতে আছে দু চারটি 'নব'। দৃশ্যের ছবির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'নব' ঘুরিয়ে কোথাও সংলাপ জোরে করছেন, কোথাও গলার স্বর নামিয়ে আনছেন। আবহসঙ্গীত কখনও দূরে কোথাও মিলিয়ে দিলেন, কোথাও যেন ঝমঝম করে বাজিয়ে তুলছেন। কোনটা করছেন আস্তে, কোনটা প্রচণ্ড চিৎকারের সামিল। এ সবই করা হচ্ছে ছবির দৃশ্যের বিষয়বস্তু ও মেজাজের সঙ্গে মিল রেখে। রেকর্ডিষ্টকে ( বা রি-রেকর্ডিষ্ট ) কেবল নাটক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেই চলবে না, সঙ্গীত-সংলাপ বা শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান থাকা দরকার।

এই সবই হচ্ছে, কিন্তু সব কিছুই তদারকি করছেন ছবির পরিচালক নিজে। রি-রেকর্ডিং করার সময় কোনটা থাকবে আর কোনটা থাকবে না সেটা শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিক করবেন। আসলে, যন্ত্রপাতির কাজটা রেকর্ডিষ্ট

বা রি-রেকর্ডিষ্টের। মূল দায়িত্ব পরিচালকের, প্রতি পদক্ষেপেই শেষ সিদ্ধান্ত তাঁকেই নিতে হয়। গোটা বইটার ভালোমন্দ তাঁর উপরই বর্তায়।

রি-রেকর্ডিং হয়ে গেল। সংলাপ, শব্দ, গান আলাদা আলাদা না থেকে একটি সাউণ্ড ফিল্মে ছবির দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এক জোট হলো। একে বলে রি-রেকর্ডেড সাউণ্ড ট্র্যাক। এবার এই সাউণ্ড ফিল্ম ও ছবির দৃশ্য তোলা হয়েছে যে ফিল্মে তা একযোগে প্রিণ্ট করা হবে। এই প্রিণ্টকে বলা হয়—'ম্যারেড প্রিণ্ট'। অর্থাৎ ছবি ও শব্দ বা পিকচার ও সাউণ্ড ফিল্মের যুগলমিলন। সুতরাং রি-রেকর্ডিং-এর চূড়ান্ত পর্যায় হলো বিয়ের কনের সাজের মতো। যেমন করে কনে বিয়ের পোশাক বা শাড়িতে সাজে। কনেটি অর্থাৎ এই ম্যারেড ফিল্ম—এখন পর্দায় লক্ষ লোকের সামনে প্রদর্শিত হতে পারে।

# সিনেমার গণিত

ছায়াছবি এখন আর তোমাদের কাছে রহস্যঘেরা কোন যাদু নয়।

এটা হলো করিগরী পদ্ধতিতে তৈরি করা একটা জিনিস। এর ফলে এমন ধারণা জন্মায় যে, নিশ্চল ছবি চলছে। এখন তো জানলে, কী করে এই মায়ার সৃষ্টি হয়।

ফিল্ম বা চলচ্চিত্র বা ছায়াছবি হলো একটা কারিগরী পদ্ধতি। এর সাহায্যে গল্প চলচ্চিত্রায়িত হয়ে থাকে। সাদা-কালো অথবা রঙীন ছবি আর শব্দ আলাদা আলাদা ভাবে গ্রহণ করা হয়, পরে সঙ্গতি রক্ষা করে তাদের মিলিয়ে দেওয়া হয়। এই দুটি ফিল্ম, মিলে গিয়ে হয় একটি ফিল্ম যেখানে শব্দ আর ছবি একই সঙ্গে দেখা যায়, শোনাও যায়।

ফিল্ম হলো একটি নতুন শিল্প মাধ্যম। বিভিন্ন শিল্পের সমন্বয় হয়েছে এই শিল্পে। অভিনয়, ছবি তোলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য সবার উপরে সঙ্গীত— এই সব শিল্প একত্র করে তবেই গড়ে উঠেছে ফিল্ম।

কিন্তু অন্যান্য শিল্পের চেয়ে এর উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো, এর পদ্ধতিগত জটিলতা। সেটা বিরাট ব্যাপার। একটি ছবি করতে কয়েকশ' লোক প্রয়োজন। প্রয়োজন ছোট বড় কয়েক ডজন যন্ত্রপাতি। সময়ও লাগে কয়েক মাস, কয়েক বছরও।

একটি বাঁশের বাঁশি, যার দাম এক টাকা, তাই দিয়ে তুমি ইচ্ছা করলে মন মাতানো বাজনা বাজাতে পারো। কিম্বা বিনে পয়সায় কেবল গলার দৌলতেই তুমি গাইতে পারো একটা মন মাতানো গান।

ধরো লেখার কথা। একটি বিখ্যাত উপন্যাস লেখার জন্য দরকার তো মোটে একটা পেনসিল আর কিছু কাগজ। খরচ বড় জোর দশ অথবা কুড়ি টাকা।

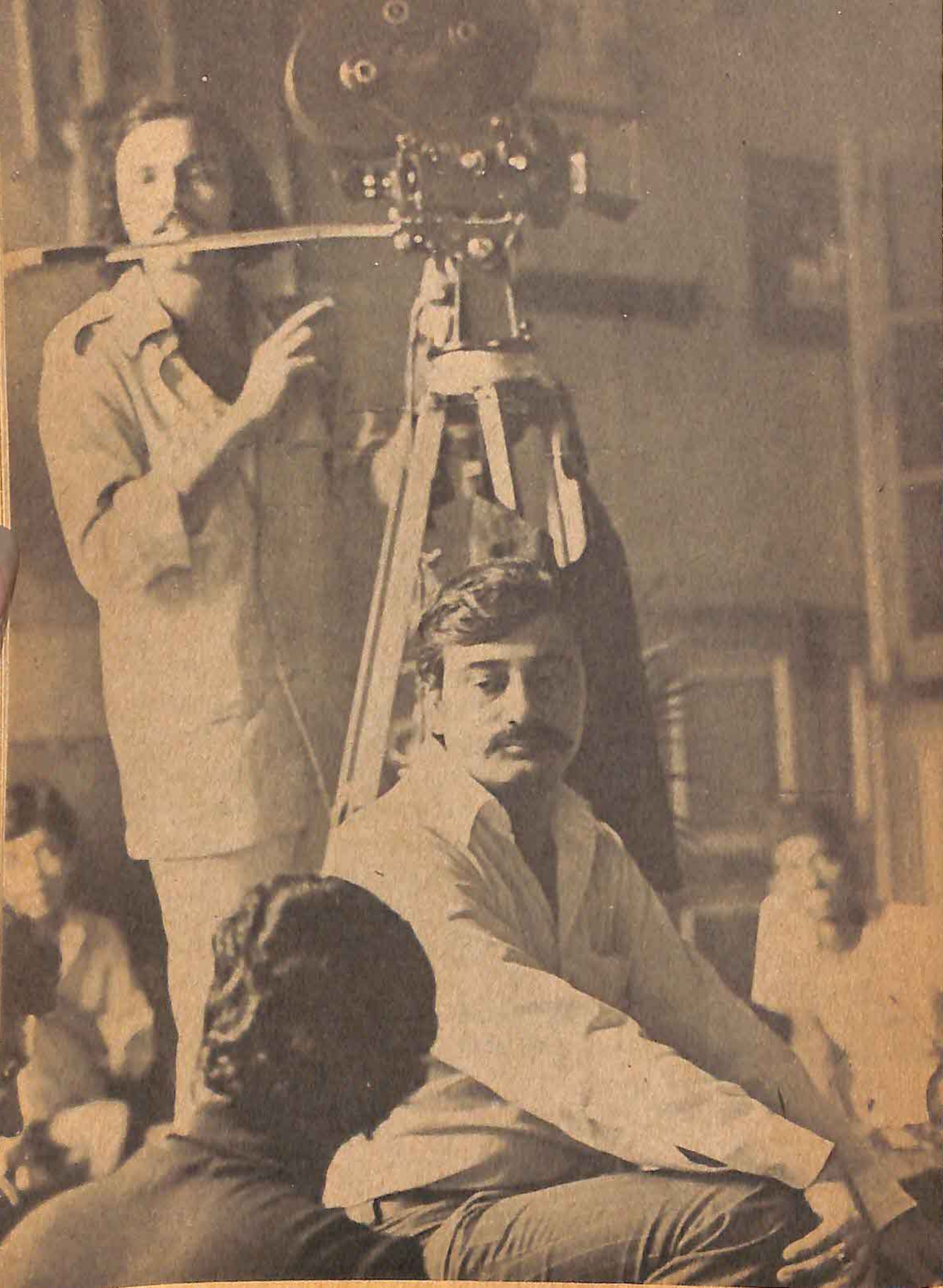
ক্যানভাসে আঁকা যায় একটি বিখ্যাত ছবি। তারও খরচ 50 অথবা 100 টাকা। কিম্বা বিনে পয়সায় স্রেফ এক টুকরো কয়লা দিয়েই দেয়ালে চমৎকার ছবি আঁকা যেতে পারে।

কিন্তু সিনেমা তৈরির খরচ কম করেও কয়েক লাখ টাকা। কয়েক ডজন দক্ষ টেকনিসিয়ানের দরকার যেমন, ক্যামেরাম্যান, সাউণ্ড রেকর্ডিষ্ট, আরট ডিরেকটর, লাইটিং ম্যান, এই রকম আরও কতো। দরকার ক্যামেরা, সাউণ্ড রেকর্ডিং বক্স, এডিটিং টেবিল, প্রজেকটারের মতো দামী সব যন্ত্রপাতী। তার উপর আছে দামী ফটোগ্রাফিক ও সাউণ্ড রেকর্ডিং ফিল্ম। এই সবকিছুর জন্য দরকার অনেক টাকা।

এক হাজার ফুট দীর্ঘ রঙীন নেগেটিভ ফিল্মের দাম 1600 টাকা ( 1975 সালের হিসাব )। এই এক হাজার ফুট ফিল্মের একটি রীল ক্যামেরায় চলবে মাত্র এগার মিনিট। খুব হিসেব করে চললেও ছবি তৈরির পর ওই ফিল্মই প্রজেকটারে চলতে পারে মাত্র তিন থেকে পাঁচ মিনিট। আড়াই ঘণ্টা চলতে পারে এরকম একটি ছবি তুলতে হলে কম করেও 40 থেকে 50 রীল নেগেটিভ ফিল্ম দরকার। খুব বড় বাজেটের ছবি তুলে থাকেন যে সব প্রযোজক, তাঁরা কয়েকশ' রীল ফিল্ম ব্যবহার করে থাকেন।

সংলাপ, সঙ্গীত বা শব্দ রেকর্ড করা হয় যে ফিল্মে, তার এক হাজার ফুট দীর্ঘ একটি রীলের দাম 400 টাকা একটি ছবির জন্য এ রকম একশ' রীল দরকার।

আড়াই ঘণ্টার একটি রঙীন ছবির প্রিন্টের জন্য খরচ পড়ে 13 হাজার টাকা। সারা ভারতের জন্য একটি ছবির কম করেও 70 থেকে 80টি



প্রিন্ট করা দরকার হয়। সাদা-কালো ছবি হলে তার একটি প্রিন্টের জন্য খরচ 4 হাজার টাকা।

সেই জন্যই সমস্ত শিল্পের মধ্যে সিনেমাই হচ্ছে সবচেয়ে ব্যয়বহুল শিল্প। এত টাকার দরকার বলেই সিনেমা তৈরির ব্যবসাটা গিয়ে পড়েছে পয়সা-ওয়ালা লোকের হাতে। আর্ট থেকে এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা ইনডাসট্রি। আর সেই জন্য লোকের মুখে শোনা যায় একটি কথা—ফিল্ম ইনডাসট্রি।

জঁা ককতো একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখক ও চিত্রপরিচালক। তিনি বলেছেন, ফিল্ম তখনই প্রকৃত শিল্প হয়ে উঠতে পারবে, যখন ক্যামেরা হবে ফাউন্টেন পেনের মতো এবং কাঁচা ফিল্ম হবে কাগজের মতো সস্তা।

তিনি একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, যতদিন পর্যন্ত সিনেমা তৈরি করতে লক্ষ লক্ষ ফ্রঁা বা টাকা লাগবে ততদিন এই শিল্প থাকবে পয়সাওয়ালা লোকের হাতের মুঠোয়। যাঁরা টাকা ঢালছেন, তাঁরা চান টাকা ফিরে আসুক, সঙ্গে আসুক যতটা সম্ভব লাভের কড়ি। আর সেইজন্যই তাঁরা ছবি তৈরি করতে গিয়ে সবসময়ই চাইবেন আকর্ষণীয় রংয়ের ব্যবহার, বিরাট সেট, ব্যয়বহুল সাজসজ্জা, দামী চিত্রতারকা, দামী পরিচালক নেপথ্য গায়ক-গায়িকা ইত্যাদি। সংবাদপত্রে, পোষ্টারের সাহায্যে প্রচারের জন্যও খরচ করেন বিস্তর টাকা। গানগুলিকে জনপ্রিয় করে তুলতে রেডিও মারফৎ খরচের পরিমাণও বড় অঙ্কের। এছাড়া প্রযোজকে প্রযোজকে প্রতিযোগিতার কারণও একটা ছবির পেছনে খরচ বাড়িয়ে দেয়। সব মিলিয়ে খরচ অনেক সময় কোটি ছাড়িয়ে যায়। মোট কথা, এই সব ছবির পেছনে 'শিল্প' সামান্যই, তার চেয়ে বেশি আছে 'টাকার হিসাব'।

সেইজন্যই কম বাজেটের ছবি তোলার যে কোন উদ্যোগকেই স্বাগত জানানো হয়। কোন কোন দেশে এখন কম খরচে ছবি তোলার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে সস্তা পোর্টেবল ক্যামেরা, সস্তা টেপ রেকর্ডার, সহজে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মত ছোট সাইজের আলোর সরঞ্জাম। এমন কি ছবি তোলা হচ্ছে স্রেফ রাস্তাঘাটেও।

ভারতের সরকারী ফিল্ম করপোরেশন তরুণ পরিচালকদের বেশ কয়েক



ক্যামেরাম্যান প্রস্তুত হচ্ছেন

লক্ষ টাকা দিয়েছেন, যাতে তাঁরা নতুন শিল্পীদের নিয়ে কম খরচে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ছবি তুলতে পারেন। অন্যভাবেও কিছু প্রযোজক কম খরচে ছবি তৈরি করেছেন। এইসব ছবির কয়েকটি নিঃসন্দেহে খুব ভালো। শিল্পসম্মত এবং আনন্দের খোরাকও তাতে আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেসব ছবি সামান্যই দেখতে পেয়েছেন। কারণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ওই সব ছবির অনেকগুলি সিনেমা হলের পর্দা পর্যন্ত পৌঁছায়নি। ছবির পরিবেশকরাও বড় বাজেটের নামী দামী নায়ক নায়িকার ছবি দেখাতে বেশি আগ্রহী। তবু পথের পাঁচালী, শহর আউর স্বপ্না, ভুবন সোম, অথবা সমসৃকার-এর মতো ছবি মুক্তি পেয়েছে। এর একটা কারণ, এই ছবিগুলি রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছে অথবা বিদেশের কোন চলচ্চিত্র উৎসব থেকে বিজয়ীর সম্মান নিয়ে এসেছে। এইভাবেই সেসব জনসাধারণের সামনে হাজির হতে পেরেছে।

তবু সঠিক লক্ষ্যের পথে এ হলো সামান্য সূচনা মাত্র।



# কেমন করে সিনেমা দেখতে হয়

এতক্ষণে তোমাদের নিশ্চয়ই একটি স্পষ্ট ধারণা হয়ে গিয়েছে, কেমন করে সিনেমা তৈরি হয়, কত খরচ পড়ে, ছবি তৈরির সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্কটাই বা কী। আমি আশা করি, এর পর তোমরা ছবি দেখবে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। ছবির ভালোমন্দও বিচার করতে পারবে সহজেই।

যারা সিনেমা দেখতে যায়, তাদের কাছে তারকাদের আকর্ষণ খুব বেশি। সুদর্শন নায়ক, সুন্দরী নায়িকা, কুটিল ভিলেন—এঁদের নামে বক্স অফিসে ভিড় বাড়ে।

কিন্তু তোমরা অনেক ছবিতেই তোমাদের প্রিয় নায়ক-নায়িকাদের অভিনয় দেখে হতাশ হয়েছো। কেননা সেসব ছবিতে গল্প অর্থহীন, পরিচালনাও নিম্নমানের, ক্যামেরার কাজও অত্যন্ত বাজে। সাউণ্ড রেকর্ডিং, সম্পাদনা এসবও ভালো নয়। বরং তোমরা অবাক হয়ে ভাবতে থাকো, নামী শিল্পীরা কী করে এমন একটা বাজে ছবিতে অভিনয় করতে রাজী হন।

কাজেই, এরপর কেবল নায়ক-নায়িকার নাম দেখে সিনেমা দেখতে যাওয়া ঠিক হবে না। সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক, প্রযোজক, গল্প লেখক, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ রচয়িতা, ক্যামেরাম্যান, সম্পাদক—এঁদের নামও দেখতে হবে। এঁদের উপরই নির্ভর করছে একটা ছবি শেষ পর্যন্ত ভালো হচ্ছে, না মন্দ হচ্ছে। যদি গল্পটাই বাজে হয়, পরিচালনা হয় নিম্নমানের তাহলে কেবল একজন নায়ক বা একজন নায়িকার পক্ষে ছবিতে মহৎ কোন শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয়।

যখন কোন ছবি দেখবে, তখন ওই ছবির ভালো বা মন্দের দিকটা বিচার করে দেখার অভ্যাস গড়ে তোলা ভালো। যদি ছবিটা ভালো হয়, আরও কয়েকবার দেখ, তাহলে ক্রমে তুমি পরিচালনা, অভিনয়, সংলাপ, ক্যামেরার কাজ, সম্পাদনা এসব বিষয়ে ভালো দিকগুলি আরও স্পষ্ট করে দেখতে পারবে, বুঝতে পারবে। তাছাড়া তোমরা নিজেরাও অনেক আনন্দ পাবে।

মনে রেখো, একটা ছবি ভালো কি মন্দ তা নির্ভর করছে তোমাদের অর্থাৎ দর্শকদের ভালো লাগা, মন্দ লাগার উপর। শেষ পর্যন্ত দর্শকরাই চূড়ান্ত রায় দেন, ছবি ভালো কি না। তাঁদের অভিমত বস্তুতঃ ছবির শিল্পকর্ম ও কারিগরী মান উন্নয়নে সহায়তা করে। কেমন করে? ভালো ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং খারাপ ছবি বর্জন করে। এ দায়িত্ব তোমাদের, দর্শকদের। এ সম্পর্কে তোমাদের সচেতন থাকতে হবে। তোমাদের বন্ধুদের সচেতন করে তুলতে হবে। একটা ভালো ছবি দেখার জন্য যখনই একটা টিকিট কাটছো, তখনই কিন্তু ভালো ছবি তৈরির ব্যাপারে তোমরা সাহায্য করলে। এইভাবে যদি একটা বাজে ছবি দেখার জন্য টিকিট কাটো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বাজে ছবি তৈরির জন্যও উৎসাহ যোগালে।

ভালো ছবিকে ভালো বলতে পারার মতো বিচার ক্ষমতা হলে, ভালো ও মন্দ ছবির পার্থক্য বুঝতে পারার বোধ জন্মালে তোমরা নিজেরাও ছবি তৈরির ব্যাপারে উৎসাহিত হতে পারবে। শুরুতে স্কুলের বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে 4 মিলিমিটার ফিল্মে ছবি তুলতে পারো। ইংলণ্ড আমেরিকা, সোভিয়েট



সত্যজিৎ রায় ক্যামেরায় চোখ রেখেছেন ►



ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়ায় স্কুলের ছেলে মেয়েরা এইভাবে শুরু করে। পরে কলেজে উঠে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে তুলতে পারো 16 মিলিমিটার ফিল্মের ছবি। তারপর 35 মিলিমিটার ফিল্মের ছবি, সাধারণ দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য। কে বলতে পারে, এই বইয়ের পাঠকদেরই কেউ না কেউ একদিন মহান পরিচালক—শান্তারাম, রাজকাপুর, হৃষিকেশ মুখার্জী বা সত্যজিৎ রায় হবে না।



